বনায়ন

ইউনিট ১২

ভূমিকা

বনায়ন বর্তমান বিশ্বের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা আর শিল্প বিপ্লবের বেগবান গতিতে আমাদের চিরচেনা প্রকৃতি আজ তার রুপ-যৌবন হারাতে বসেছে। আমরা হারাতে বসেছি বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন নির্মল পরিবেশ। তাই সুস্থ-সুন্দর জীবনের জন্য সবুজ প্রকৃতি রক্ষার্থে গাছ লাগানোর মাধ্যমে বনায়ন ব্যতীত বিকল্প কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। বন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। মানব সভ্যতার উন্মেষ, ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নের জন্য বনের অবদান অনস্বীকার্য। বন মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মত মৌলিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া বন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, বন্যা, প্লাবন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখে। অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বনসম্পদ আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে তথা জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে চাক্ষুষ ভূমিকা পালন করে। এ ইউনিটে বন, বনের ধরণ, বনায়ন, বন সংরক্ষণবিধি, বন নার্সারি, বৃক্ষ কর্তন, কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সাম্যক আলোচনা করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বন তথা বনায়নের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে প্রতীয়মান হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৪ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১২.১ : বন, বনের ধরন ও বনায়ন
পাঠ - ১২.২ : বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের বিস্তৃতি
পাঠ - ১২.৩ : বন সংরক্ষণ বিধি
পাঠ - ১২.৪ : বন নার্সারি
পাঠ - ১২.৫ : বন নার্সারির বীজ ও চারা উৎপাদন কৌশল
পাঠ - ১২.৬ : বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ, কাঠের পরিমাণ
পাঠ - ১২.৭ : কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি
পাঠ - ১২.৮ : উপকূলীয় বনায়ন
পাঠ - ১২.৯ : ব্যবহারিকঃ গোল কাঠ বা তক্তা পরিমান

পাঠ-১২.১ বন, বনের ধরন ও বনায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন বনের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বনায়নের ধরণ ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বন, বনায়ন, পর্ণমোচী বন, ক্রান্তীয় বন

বন

বৈশিষ্ট্যসূচক বাহ্যিক চেহারা ও গঠনসহ গাছপালার একককে বন বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে আপনা হতে যখন ছোট-বড় বৃক্ষলতা ও গাছপালা জন্মে বিস্তীর্ণ এলাকা আচ্ছাদিত করে ফেলে, তখন সে বিস্তীর্ণ এলাকাকে বনভূমি বলে। অরণ্য বা বন হল ঘন বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের দ্বারা ঘেরা একটি এলাকা।

বনায়ন

বনায়ন হলো বনভূমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছ লাগানো, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করা। সঠিকভাবে বনায়ন করা সম্ভব হলে, সর্বাধিক বনজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এসব বনজদ্রব্য হলো কাঠ, জ্বালানি, বনৌষধি, ফল, মধু, মোম প্রভৃতি। বনায়নের জন্য আমাদের বিভিন্ন প্রকার বনজ বৃক্ষ, ফলজ বৃক্ষ, নির্মাণ সামগ্রী ও ঔষধি উদ্ভিদ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা দরকার। এ অধ্যায়ে আপনি এসব উদ্ভিদের পরিচিতি, চাষ পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন। পাশাপাশি নার্সারিতে নতুন চারা তৈরি করতে পারবেন। প্রাত্যহিক জীবনে বনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং এ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

বনের বৈশিষ্ট্যঃ

প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যেভাবেই বন সৃষ্টি হউক না কেন, একটি বনের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকে যা নিম্নরূপঃ

১। প্রাকৃতিকভাবে গঠিত এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় আচ্ছাদিত বৃক্ষরাজির সমষ্টিই হল বন।
২। বনের আয়তন বিশাল হবে এবং যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির বৃহদাকার বৃক্ষরাজি থাকবে।
৩। বড় বৃক্ষের পাশাপাশি ছোট-বড় ঝোপঝাড় থাকবে।
৪। বনে বৃক্ষরাজির স্তরবিন্যাস থাকবে অর্থাৎ গাছপালা উঁচু, নিচু ও মাঝারি স্তরে বিন্যস্ত থাকবে।
৫। বিভিন্ন বৈচিত্র্যের বন্য প্রাণী, পাখি ও কীট-পতঙ্গ থাকবে।
৬। বনের গাছপালা ও পশু পাখির খাদ্যস্তর ও খাদ্য শিকলের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া থাকবে।

বনের ধরন ও শ্রেণীভুক্তিকরণ

বিভিন্নভাবে এবং বিশেষত্বের বিভিন্ন মাপকাঠিতে বনগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তারই একটির পরিভাষা হলো বায়োম। প্রজাতির অধিকাংশের পাতার দীর্ঘজীবনের সঙ্গে কীভাবে গাছপালা টিকে থাকে তাকেই প্রকাশ করা হয় এ বায়োম শব্দ দিয়ে। আরেকটা স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বন রয়েছে, যেখানে বনগুলি বড় পাতার গাছ, সরলবর্গীয় (সুঁচালো পাতা) গাছ অথবা মিশ্র ধরনের গাছ দিয়ে সাজানো থাকে।

১. উপমেরু অঞ্চলে অরণ্য রয়েছে। এগুলি সাধারণত চির হরিৎ ও সরলবর্গীয় ধরনের হয়।
২. শীতপ্রধান এলাকায় বড় পাতার পর্ণমোচী গাছের বন (যথা- শীতপ্রধান পর্ণমোচী বন) এবং চির হরিৎ সরলবর্গীয় বন (যথা- শীতপ্রধান সরলবর্গীয় বন ও শীতপ্রধান বৃষ্টি অরণ্য), আবার উভয় ধরনের বনই হতে পারে। গ্রীষ্মপ্রধান

এলাকায় আবার জলপাই জাতীয় বৃক্ষের চিরসবুজ পাতাওয়ালা গাছের বনসহ বড় পাতার চিরহরিৎ অরণ্য টিকে থাকতে পারে।

৩. ক্রান্তীয় এবং প্রায় ক্রান্তীয় বনের অন্তর্ভূক্ত হলো ক্রান্তীয় এবং প্রায় ক্রান্তীয় আর্দ্র বন, ক্রান্তীয় এবং প্রায় ক্রান্তীয় শুষ্ক বন এবং ক্রান্তীয় ও প্রায় ক্রান্তীয় সরলবর্গীয় বন।

কোনো জঙ্গলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাদের সামাগ্রিক প্রাকৃতিক কাঠামো অথবা উন্নয়েনের বিভিন্ন পর্যায়ের অবস্থার ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যস্ত হয়। জলবায়ু ও কোন প্রজাতির গাছ বেশি রয়েছে, তার ভিত্তিতেও বনগুলিকে আরো নির্দিষ্টভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করা যায়, ফলস্বরূপ বহু ধরনের বনের ধরন পাওয়া যায় (যথা, পোন্দেরোসা পাইন/ডগলাস ফার বন)

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষকের বনের সংজ্ঞা ও বনের প্রকারভেদের উপর আলোচনা অনুসরণপূর্বক শিক্ষার্থীরা একটি ক্লাশ নোট প্রস্তুত করবে।

সারসংক্ষেপ

লোকালয় থেকে দূরে যখন অনেক গাছপালা একত্রে জন্মায় এবং যেখানে বন্য পশুপাখি একত্রে বসবাস করে তখন তাকে বন বলা হয়। গোটা বিশ্বে বহু সংখ্যক বন প্রকারভেদ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, কিন্তু কোনাটাই সর্বজনীন স্বীকৃত নয়। অন্যান্য জটিল ব্যবস্থার থেকে বন প্রকারভেদ ব্যবস্থা একটা সরলীকৃত ব্যবস্থা। বিশ্বজুড়ে এ ব্যবস্থাটি বনগুলিকে ২৬টি মূল শ্রেণীতে ভাগ করেছে, যাতে জলবায়ু এলাকার পাশাপাশি প্রধান গাছপালার চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। ক্রান্তীয় বনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল-
ক) ভেজা ও শুষ্ক খ) বৃষ্টিবহুল গ) মৌসুমি জলবায়ু সম্পন্ন ঘ) চিরসবুজ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
বন অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ যা আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন উৎপাদন সরবারহ করে থাকে। আকার, আয়তন, গঠন, বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর বনভূমি বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হবে।

২। 'সরলবর্গীয় বন ও চির হরিৎ' কোন বনের বৈশিষ্ট্য-
ক) উপমেরু বন খ) সুন্দরবন
গ) শীত প্রধান পর্ণমোচী বন ঘ) ক্রান্তীয় বন

৩। "ডগলাস ফার বন" শ্রেণীর বনভূমিতে দেখা যায় কোন উদ্ভিদ
ক) পাইন খ) কাঠাল
গ) সুন্দরী গাছ ঘ) শাল

পাঠ-১২.২ বাংলাদেশের বনাঞ্চলে স্থিতি ও বিভিন্ন প্রকার বন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের বিস্তৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন বনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন বনায়নের ধারণা আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বনাঞ্চল, পাহাড়ি বন, কৃষি বন, সামাজিক বন, ম্যানগ্রোভ বন।

বন একটি দেশের মূল্যবান সম্পদ। আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি হিসাব মতে বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূমির আয়তন প্রায় ২২.৫ লক্ষ হেক্টর। বনভূমির এ পরিমাণ দেশের মোট ভূমির শতকরা ১৭ ভাগ। এ বন সারাদেশে সমানভাবে বিস্তৃত নয়। অধিকাংশ বনভূমি দেশেরপূর্ব, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ খুবই কম। অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ ভাগগুলো হলো-

১। পাহাড়ি বন
২। সমতলভূমির বন
৩। ম্যানগ্রোভ বন
৪। সামাজিক বন
৫। কৃষি বন

নিচের ছকে অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টর) দেখানো হলো-

বনের ধরন	প্রাকৃতিক বন	কৃত্রিম বা সৃজিত বন	মোট
পাহাড়ি বন	১১.০৬	২.১০	১৩.১৬
ম্যানগ্রোভ বন	৬.১৬	১.৩৪	৭.৫০
সমতল ভূমির বন	০.৮৭	০.৩৬	১.২৩
গ্রামীণ বন	-	২.৭০	২.৭০

বনাঞ্চলের ধরন ও বৈশিষ্ট্যঃ

পাহাড়ি বন

ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য এ বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বনে কিছুটা আধা চিরসবুজ ও পত্রমোচী বৃক্ষও থাকে, কিন্তু তাতে বনের চিরসবুজ প্রকৃতি বদলায় না। চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কক্সবাজার ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মৌলভীবাজার জেলায় এ ধরনের বনভূমি রয়েছে। বৃক্ষসমূহ ৪৫-৬২ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। আর্দ্র ছায়া ঢাকা স্থানে পরাশ্রয়ী অর্কিড, ফার্ন ও ফার্নজাতীয় উদ্ভিদ, লতা, মস, কচু, বেত ইত্যাদি প্রায় সর্বত্রই জন্মে। গুল্ম, বীরুৎ ও তৃণ কম, এ জাতীয় বনে প্রায় ৭০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে। কালিগর্জন, ধলিগর্জন, সিভিট, ধুপ, কামদেব, রক্তন, নারকেলি, তালী, চুন্দাল, ডাকিজাম ইত্যাদি সাধারণ চিরহরিৎ বৃক্ষ প্রজাতি যেগুলি সর্বোচ্চ ছাউনি সৃষ্টি করে। চাঁপা, বনশিমুল, চাপালিশ, মাদার ইত্যাদি আধাচিরহরিৎ ও চিরহরিৎ বৃক্ষ বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে। পিতরাজ,

চালমুগরা, ডেফল, নাগেশ্বর, কাউ, গোদা, জাম, ডুমুর, করই, ধারমারা, গামার, তেজবল মদনমাস্তা, আসার, মুস, ছাতিম, তুন, অশোক, বড়মালা, ডাকরুম, বুরা ইত্যাদি দ্বিতীয় স্তরের ছাউনি সৃষ্টি করে।

ক্রান্তীয় আধা-চিরসবুজ বন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাধারণত চিরহরিৎ, কিন্তু পত্রমোচী বৃক্ষেরও প্রাধান্য রয়েছে। এ বনভূমি সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিনাজপুরের পাহাড়ি এলাকা নিয়ে গঠিত। প্রধানত এখানে জুমচাষ করা হয়। এখানে আট শতাধিক প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে। চিরসবুজ বন অপেক্ষা এ জাতীয় বনে গাছতলায় উদ্ভিদ অধিক জন্মে। এখানে জন্মানো উঁচু আচ্ছাদন সৃষ্টিকারী বৃক্ষ ২৫-২৭ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। নাগেশ্বর, উড়িআম, নালিজাম, গোদাজাম, পীতজাম, ঢাকিজাম ইত্যাদি মধ্যমাঞ্চলে ছাউনি সৃষ্টিকারী বৃক্ষ। ডেফল বনশিমুল, শিমুল, শিলকরই, চুন্দুল, গুজা বাটনা, কামদেব, বুরা গামারি, বহেড়া ও মুস উপরের ছাউনি অশোক, জলপাই ও দারুম নিচু ছাউনি সৃষ্টি করে। সাধারণ চিরসবুজ উদ্ভিদ প্রজাতিগুলি হলো গর্জন, শিমুল, বনশিমুল, বাটনা, চাপালিশ, তুন, করই, জলপাই। এ বনভূমির উদ্ভিদের উত্তরাংশের সঙ্গে পূর্ব-হিমালয় ও দক্ষিণাংশের সঙ্গে আরাকানের উদ্ভিদের সাদৃশ্য রয়েছে। এ বনগুলির মোট আয়তন প্রায় ৬,৪০,০০০ হেক্টর যা বাণিজ্যিক কাঠের ৪০% যোগায়।

সমতলভূমির বন

বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা অঞ্চলের বনকে সমতল ভূমির বন বলে। এ বনের প্রধান প্রধান বৃক্ষ শাল ও গজারি; এছাড়া কড়ই, রেইনটি, জারুল ইত্যাদি বৃক্ষও এ বনে জন্মে থাকে। সমতলভূমির প্রাকৃতিক বনের কাছাকাছি বসতি থাকায় এ বনের উপর মানুষের চাপ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক বনের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক স্থান বনশূন্য হয়ে পড়েছে। সরকারিভাবে এসব এলাকায় সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জনগনের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোনো কোনো স্থানে সামাজিক বনায়ন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ বনের শাল কাঠ খুবই উন্নতমানের হয়ে থাকে। গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরি ও অন্যান্য নির্মাণ কাজে শাল কাঠের ব্যবহার করা হয়। এ বনের বন্য প্রাণী প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে কোথাও কোথাও অল্প সংখ্যক নেকড়ে, হরিণ, বানর, সাপ, ঘুঘু, দোয়েল ও শালিক দেখা যায়।

চিত্র ১২.১.১: বনভূমির অবস্থান ও বিস্তৃতি অনুসারে বাংলাদেশের বনাঞ্চলে (পাহাড়ি বন, সমতলভূমির বন, ম্যানগ্রোভ বন, সামাজিক বন)

ম্যানগ্রোভ বন

খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণের বিস্তৃত এলাকা ম্যানগ্রোভ বলে পরিচিতি । বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এ বন অবস্থিত। প্রত্যহ সামুদিক জোয়ারের পানিতে এ বন প্লাবিত হয় বলে একে লোনা পানির বনও বলা হয়। জোয়ার ধৌত বন খুলনা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের এ উপকূলীয় বনগুলি বাংলাদেশের সর্বাধিক উৎপাদনশীল বনভূমি। প্রতিবার জোয়ারের সময় এ বনভূমি সমুদ্রের পানিতে প্লাবিত হয়। এখানকার চিরসবুজ গাছগুলির আছে বায়ুমূল এবং বংশবিস্তার জরায়ুজ ধরনের। সুন্দরী ছাড়াও পশুর, গেওয়া, কেওড়া, কাঁকড়া, বাইন, ধুন্দুল, আমুর ও ডাকুর দলবদ্ধভাবে জন্মে। উপকূলীয় পানির ঘোলাটে ভাব ও লবণাক্ততা সেখানকার প্রজাতিগুলির বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। সুন্দরবন ছাড়াও গাঙ্গেয় বদ্বীপের অনেকগুলি চরই ম্যাগ্রোভের গভীর বনে ঢাকা, নেই শুধু সুন্দরী। নদীর পলি জমে ওঠা তীর ও ফাটলেই এসব প্রজাতি দ্রুত বেড়ে ওঠে। নদী ও খালের পাড়ে ঠেসমূলীয় প্রজাতির প্রাধান্য দেখা যায়। সুন্দরী বৃক্ষের নামানুসারে এ বনের নামকরণ করা হয়েছে সুন্দরবন। এ বনের অধিকাংশ উদ্ভিদের উর্ধ্বমুখী বায়বীর মূল রয়েছে। যার সাহায্যে এরা শ্বসন ক্রিয়ার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। কারণ জলাবদ্ধ মাটি থেকে সাধারণ মূলের পক্ষে অক্সিজেন গ্রহণ সম্ভব নয়। বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এ বনে বাস করে। চিতাবাঘ, হরিণ, বানর, অজগরসহ বিচিত্র রকমের পাখি ও কীট-পতঙ্গ এ বনে বাস করে। সুন্দর বনের নদী ও খালে কুমির ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বাস করে। প্রতি বছর সুন্দরবন থেকে প্রচুর মধু ও মোম পাওয়া যায়। সুন্দর বন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ও সম্পদশালী ম্যানগ্রোভ বন হলো এ সুন্দরবন। এবনের মোট আয়তন ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার।

সামাজিক বন

সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে। জনগণের স্বত্বঃফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণে যে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়, তাকেই সামাজিক বনায়ন বলা হয়। সামাজিক বনায়ন হলো এমন বন ব্যবস্থাপনা বা কর্মকান্ড যার সাথে পল্লির দরিদ্র জনগোষ্ঠী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর মাধ্যমে উপকারভোগী জনগন জ্বালানী, খাদ্য, পশুখাদ্য ও জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পেয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকার জন্মা লগ্ন থেকেই সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এতে জনসাধারণ সরাসরি অংশগ্রহণ করছে এবং উপকৃত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রায় সকল সড়ক, মহাসড়ক ও রেল লাইনের পাশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রধানত উঁচু ও মাঝারি উঁচুজমিতে সামাজিক বন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তাঃ

১। জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।
২। দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো এবং দারিদ্র্য বিমোচন।
৩। পতিত জমি, বসতভিটা, সড়ক, রেলপথ, বাঁধ, খাল বিল ও নদীর পাড়ে, বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানের বনায়নও পরিবেশ সংরক্ষণ করা ।
৪। পশুখাদ্য, শাকসবজি, ফলমূল, ভেষজ ও বিনোদনের জন্য বন সৃজনকরা ।
৫। বন উৎপাদিত কাঁচামাল গ্রামীণ কুটির শিল্পে সরবরাহ করা ও জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৬। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দূষণ রোধ,ভূমিক্ষয় রোধ করা ও মরুবিস্তার রোধ করা।
৭। গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের জন্য কাঠের জোগান দান ও জ্বালানি কাঠের ঘাটতি পূরণকরা ।

কৃষি বন

কৃষি বনায়ন হলো কোন জমি থেকে একই সময়ে বা পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন গাছ, ফসল ও পশুপাখি উৎপাদন ব্যবস্থা। সাধারণভাবে কৃষি বনায়ন হচ্ছে এক ধরনের সম্মতি ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এতে কৃষি ফসল, পশু, মৎস্য এবং অন্যান্য কৃষি ব্যবস্থা সহযোগে বহু বর্ষজীবী কাষ্ঠল উদ্ভিদ জন্মানোর ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ কৃষি বনায়ন হচ্ছে একই ভূমি/ভূখন্ড থেকে কৃষি ফসল এবং বনজ দ্রব্য যুগপৎ কিংবা পর্যায়ক্রমিকভাবে উৎপাদন করা। পরিবেশ বাঁচানো, জ্বালানি সরবরাহ, কাঁঠ ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাপী কৃষি বনের প্রসার ঘটছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে কৃষি বনায়ন পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটছে।

কৃষি বনায়নের বৈশিষ্ট্য

১। বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও ফসলের সমাহার ঘটে বিধায় উৎপাদন ঝুঁকি কমে যায়।
২। একই জমি বারবার ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়।
৩। সামাজিক ও পরিবেশগত গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।
৪। ফসল খামার মালিক, মিশ্র খামার মালিক ও বন বাগান মালিকের চাহিদা পূরণ হয়।
৫। প্রান্তিক ভূমিজ সম্পদ ব্যবহার হয়।
৬। স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারে সুযোগ থাকে।
৭। খামারের উৎপাদন স্থায়িত্বশীল হয় ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে।

কৃষি বনায়ন : পদ্ধতি ও প্রকার

১। কৃষি তৃণবন : ফসলের জোড় চাষ হয় ও মাঝে মাঝে বনজ গাছের উৎপাদন করা যায়।
২। তৃণবন : মিশ্র খামার হয়ে থাকে। প্রধান উদ্দেশ্য পশুখাদ্য উৎপাদনকরা।
৩। ফসল-বন : বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গাছ ও আন্তঃফসল সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদনকরা।
৪। কৃষিবন মৎস্য খামার : মিশ্র খামার করা যায়। উঁচু নিচু সমন্বয়ে খামার স্থাপন করতে হয়। ফসল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ও মৎস্য উৎপাদন করা যায়।

কৃষিবনের প্রয়োজনীয়তা

১। ফসলি জমির বহুবিধ ব্যবহার করে উৎপাদন ঝুঁকি কমিয়ে আনা।
২। এলাকা ভিত্তিক কৃষি বাজার তৈরি করে গ্রামীণ জনজীবনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন।
৩। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
৪। মাটির-উর্বরতা বৃদ্ধি করা এবং মাটিক্ষয় রোধ করা।
৫। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা।
৬। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার করা।
৭। বিরাট জনগোষ্ঠীর কাজের ব্যবস্থা করা ও দারিদ্র্য হটানো
৮। কৃষি গবেষণার ফলাফলভিত্তিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।
৯। পশুখাদ্য উৎপাদন এবং পশু পাখি ও উপকারী কীট পতঙ্গের নিরাপদ আবাস তৈরি করা।
১০। খাদ্যের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন প্রকার বনভূমির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সমূহ খাতায় ছক আকারে উপস্থাপন করা এবং তা বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষর্থীরা প্রতিবেদন তৈরি করে ক্লাশে উপস্থাপন করবে।

সারসংক্ষেপ

বন নানান ধরনের হতে পারে। প্রধানত একে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-পাহাড়ি বন, সমতলভূমির বন, ম্যানগ্রোভ বন, সামাজিক বন, কৃষি বন। তবে প্রত্যেক প্রকার বনের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও সরকার নিয়ন্ত্রিত দেশের বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রনাধীন অশ্রেণিভূক্ত বন রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সুন্দর বনের মোট আয়তন কত?
ক) ৩০০০ বর্গকিমি খ) ৪০০০ বর্গকিমি গ) ৫০০০ বর্গকিমি ঘ) ৬০০০ বর্গকিমি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও
কে. বি. কলেজের একদল ছাত্রী মিলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বনে বেড়াতে গেল। সেখানে তাঁরা কিছু বিচিত্র গাছ ও প্রাণীর সন্ধান পেল।

২। "বাইন" ও "আমুর" কোন শ্রেণির বনভূমির বৃক্ষ?
ক) পাহাড়ি বন খ) সমতলবনভূমি গ) ম্যানগ্রোভ বনভূমি ঘ) কৃত্রিম বন

৩। রয়েল বেঙ্গল টাইগার কোন বনে দেখা যায়?
ক) মধুপুর বন খ) ভাওয়াল বন গ) সুন্দর বন ঘ) রাজশাহী বনাঞ্চল

৪। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূমির আয়তন প্রায়-
ক) ২১.৫৩ হেক্টর খ) ২০.৫৩ হেক্টর গ) ২২.৫০ হেক্টর ঘ) ২৫.৩৫ হেক্টর

৫। জোয়ারভাটা দেকা যায় কোন বনভূমিতে?
ক) পাহাড়ি খ) সমতল
গ) কৃষি বন ঘ) ম্যানগ্রোভ

পাঠ-১২.৩ বন সংরক্ষণ বিধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বন সংরক্ষণ বিধি সম্পর্কে জানতেপারবেন ।
- বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- বন সংরক্ষণ নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- বন সংরক্ষণের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।
- বন সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	বন সংরক্ষণ বিধি, বন্য প্রাণী আইন, অধ্যাদেশ, বনদস্যু

বন সংরক্ষণ বিধি

বনভূমির সকল লতাগুল্ম, বৃক্ষরাজি ও বন্যপ্রাণী নিয়ে বনজ সম্পদ গঠিত । এ বনজ সম্পদ একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ । বনভূমির এসব গাছপালা ও বন্য প্রাণীর মধ্যে নিবিড় আন্তঃসর্ম্পক বিরাজমান । কোনো কারণে এর যে কোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যগুলো আপনা-আপনি ধ্বংস হয়ে যায় । কোনো অঞ্চলে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি বা সরকারি বনাঞ্চলে থেকে গাছ কাটা, অপসারণ, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধান রয়েছে । এসব আইন বা বিধানকে বন বিধি বা বন আইন বলা হয় । বনভূমির সকল সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যাবস্থাপনার জন্য এ উপমহাদেশে ১৯২৭ সালে বন সংরক্ষণ আইন করা হয় যা বন "আইন, ১৯২৭" নামে পরিচিতি । পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে এ আইনের বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন করে যা "বন আইন (সংশোধন), ১৯৯০" নামে পরিচিতি । এ আইনের পর অবৈধ বন ধ্বংসের প্রবণতা কমে বটে কিন্তু পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব হয় না । সুতরাং ১৯৯০ সালের এ আইনকে সময় উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে এ আইনের আরও কিছু সংশোধনী আনা হয় । এ আইন বলে বনজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে । এসব বিধিনিষেধ লঙ্গনের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে । এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বনবিধি বলে আরও যা করতে পারবেন তা হলো ।

১. সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কোন বনভূমিতে সংরক্ষিত বন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন ।
২. এ প্রজ্ঞাপন বলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা অন্যকোনো দাবিদার প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হতে নূন্যতম তিনমাস এবং অনধিক চার মাসের বন কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে নিজে হাজির হয়ে ক্ষতির বিস্তারিত উল্লেখ করে আবেদন করতে পারবেন ।
৩. সরকার একইভাবে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখ হতে সংরক্ষিত কোনো বন বা তার অংশ বিশেষ সংরক্ষিত, রহিত এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন ।

বনবিধির বর্ণনা

এসো আমরা এবার বন সংরক্ষণের প্রচলিত আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ জেনে নেই । এ বিধি বলে নিম্নলিখিত কাজসমূহ দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে । যথা :

১. অনুমতি ব্যতীত আধাসরকারি বা স্থানীয় সরকারি জমি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব জমি বা বাগান হতে কাঠ বা অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজ জেলার যে কোনো স্থানে প্রেরণ ।
২. যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সরকারি বনাঞ্চলে প্রবেশ করা, বনভূমিতে ঘরবাড়ি ও চাষাবাদ করে বনাঞ্চলের ক্ষতিসাধন করা ।

৩. বনে শিকার করা, গুলি করা, মাছ ধরা, জল বিষাক্ত করা অথবা বনে ফাঁদ পাতা।
৪. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত সরকারি বনভূমি থেকে গাছপালা ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ করা।
৫. প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতীত বনের গাছ কাটা, অপসারণ ও পরিবহন করা।
৬. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ব্যতীত অন্য সময়ে আগুন জ্বালানো, আগুন রাখা বা বহন করা।
৭. বনের কাঠ কাটার অথবা কাঠ অপসারণের সময় অসাবধানতাবশত বনের ক্ষতিসাধন করা, গাছ ছেটে ফেলা, ছিদ করা, বাকল তোলা, পাতা ছেড়া, পুড়িয়ে ফেলা অথবা অন্য কোনো প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করা।
৮. বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো সংরক্ষিত বনে আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ করা।
৯. বনাঞ্চলে গবাদিপশু চরানো।
১০. যথাযথ অনুমতি ব্যতীত বনের মধ্যে খাদ খোড়া, চন বা কাঠ কয়লা পোড়ানো অথবা কাঠ ব্যতীত অন্য কোনো বনজাত পণ্য সংগ্রহ করা অথবা শিল্পজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করা, অপসারণ করা।
১১. বনজ দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অপসারণ, পরিবহন ও হস্তান্তর করা।
১২. বন কর্মকর্তা অথবা বন রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজে বাধা প্রদান করা।

বন আইন লঙ্ঘণের শাস্তির বিধান

বন আইন লঙ্ঘণের বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে। উপরোক্ত আইন ভঙ্গের জন্য নূন্যতম ছমাসের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জেলসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বিধান রয়েছে। এসব অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্টেট আদালতে হয়ে থাকে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সনে একটি আইন প্রণয়ন করেন যা বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ), অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ নামে অভিহিত। এ আইন বলে বিনা অনুমতিতে যে কোনো উপায়ে বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা, বন্যপ্রাণী প্রজননে বিঘ্ন সৃষ্টি, জাতীয় উদ্যানের সীমানার একই মাইলের মধ্যে কোনো প্রাণী শিকার, বিদেশি প্রাণী আমদানি বা বিদেশে রপ্তানি করা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ আইন লঙ্ঘণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি লঙ্ঘণকারীকে আদালত ছয়মাসের জেলসহ পাঁচশত টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুই বৎসরের জেলসহ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবেন। এ আইন ভঙ্গকারীকে আর্থিক জরিমানাসহ বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে মানুষের জীবন বাঁচাতে, ফসলের ক্ষতি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়।

বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা

দেশের বিরাজমান বন সংরক্ষণ ও নতুন বন সৃষ্টি করে দেশের বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এখনকার সময়ের দাবি। কারণ বন পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। এ অধিক জনসংখ্যা মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য সীমিত বনজ সম্পদের উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে। প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ বনের বৃক্ষরাজি ও বন্য প্রাণী উজাড় করছে। বন ধ্বংস হওয়ার কারণে বন্য প্রাণীর আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, প্রজনন বিঘ্নিত হচ্ছে, খাদ্য সংকট হচ্ছে। অবৈধ শিকারীর কবলে পড়েও বন্য প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে। বনে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়ছে। বনজ সম্পদ চুরি ও পাচার করেও এক শ্রেণির অসাধু লোক বন ধ্বংস করছে। বনের নিকটবর্তী এলাকাবাসী ধীরে ধীরে বন দখল করছে। বন এলাকায় অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে। অসাধু চক্র পার্বত্য এলাকায় পাহাড় কেটে, কাঠ পাচার করে পাহাড়ি বন ধ্বংস করছে। এ ছাড়াও সামাজিক বনের বৃক্ষরাজি আত্মসাৎ করছে। এর ফলে ভূমিক্ষয়, ভূমিধসসহ নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। দেশ পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বনজসম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বনসংরক্ষণ বিধি প্রণীত হয়েছে। বনবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসংযোগ বাড়াতে হবে। বন সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি বাস্তবায়িত হলে অনেক সুফল পাওয়া যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বন সংরক্ষণ বিধি ও বন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখ এবং তা তোমার সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা কর।

সারসংক্ষেপ

বন ও বন্য প্রাণী রক্ষার ক্ষেত্রে আইনের বাস্তবায়নের ভূমিকা সর্বাধিক। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের ভূমিকা সমানভাবে অগ্রাধিকার। বন রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি কাজ করতে হবে- বনদস্যুদের প্রতিহত করতে হবে। জনগণকে বনের গুরুত্ব বোঝাতে হবে। সামাজিক বন সৃষ্টিতে সবাইকে অংশ নিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। উপমহাদেশে বন সংরক্ষণ আইন করা হয়-
ক) ১৯৯৩ খ) ১৯২৭ গ) ১৯২৫ ঘ) ১৯৩০

২। বন আইন ভঙ্গের সর্বনিম্ন শাস্তি কত বছরের জেল-
ক) ১০ মাস খ) ৮ মাস গ) ৭ মাস ঘ) ৬ মাস

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও

অধিকাংশ নাগরিক বন ও বন্য প্রাণী এবং পরিবেশ রক্ষার আইন সম্বন্ধে অবগত নয়। এমনকি তারা আইন লঙ্ঘনের শাস্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণই অজ্ঞ।

৩। ১৯৭৩ সালের প্রণীত হয় যা অভিহিত-
ক) বনভূমি আইন খ) বনভূমি বিধিমালা
গ) বনপ্রাণী সংরক্ষন অধ্যাদেশ ঘ) বনদস্যুদের প্রতিহত আইন।

৪। বন আইন লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান কার্যকর করেন-
ক) বিদ্যুৎ আদালত খ) পরিবেশ আদালত
গ) কেন্দ্রীয় আদালত ঘ) ১ম কেজির ম্যাজিস্টেট আদালত

৫। বন বিষয়ক আইন এ পর্যন্ত কতবার সংশোধিত হয়-
ক) একবার খ) দুইবার গ) তিনবার ঘ) চারবার

পাঠ-১২.৪ বন নার্সারি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বন নার্সারি কি বলতে পারবেন
- বন নার্সারির ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- বিভিন্ন বন নার্সারির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বন নার্সারির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নার্সারির অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	বন নার্সারি, পলি ব্যাগ, বেড নার্সারি, কাটিং ও মোথা

বন নার্সারি

বাংলাদেশে কৃষির লাভজনক যে সব সেক্টর রয়েছে তার মধ্যে নার্সারি পেশা অন্যতম । যে জায়গায় চারাগাছ উৎপন্ন করে অন্য কোথাও রোপণের আগ পর্যন্ত তা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তাকে নার্সারি বলে । আভিধানিক অর্থে বনজ নার্সারি হলো চারা গাছের আলয় বা চারালয় । আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি আদর্শ নার্সারি থেকে সুস্থসবল ও সুন্দর চারা পাওয়া সম্ভব । নার্সারিতে বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয় । আবার আধুনিক পদ্ধতিতে কলম থেকেও উন্নতমানের চারা উৎপাদন করা হয় । বন নার্সারি ব্যবসার মৌসুম হলো বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত । বর্ষাকালে চারা সহজেই বাঁচে এবং দ্রুত বড় হয় । এজন্য এ সময়ে চারা বেশি বিক্রি হয় । শীতকালে চারা বড় হয় না এবং গরমের দিনে চারা শুকিয়ে মরে যায় । মূলত আষাঢ়, শ্রাবণ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাল বিক্রি হয় । এ ব্যবসার মাধ্যমে অবসর সময়ে অল্প জায়গায় বেশি চারা উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে ভালো টাকা আয় করা সম্ভব ।

চিত্র: ১২.৪ : বন

নার্সারির প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক কৃষিতে নার্সারির গুরুত্ব অপরিসীম । নার্সারি ছাড়া কৃষি কাজ অসম্পূর্ণই বলা চলে । এর প্রধাণ কাজ হলো চারা উৎপাদন ও চারার যত্ন নেয়া । তবে প্রকৃতপক্ষে নার্সারিতে বীজ উৎপাদন, অংগজ চারা উৎপাদন, বিভিন্ন রোপন দ্রব্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, জাত উৎপাদন, ক্ষণস্থায়ী গাছের ব্যবস্থাপনা, স্থায়ী গাছের ও বীজ উৎপাদনকারী মাতৃগাছের সঠিক পরিচর্যা করা ইত্যাদি কর্মকান্ড করা হয় । নার্সারি কেবল উন্নতমানের বীজ ও চারার সরবরাহই নিশ্চিত করেনা জনগনের কর্মসংস্থাসহ পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা করে । যে এলাকায় ভাল নার্সারি আছে সে এলাকায় গাছ-পালার সরবরাহ বেশী থাকে । ফলে মানুষের শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে । নার্সারির অর্থনৈতিক গুরুত্বও অনেক । ছোট ছোট নার্সারি থেকে বছরে লাখ লাখটাকা আয় করা সম্ভব । কারণ এক বর্গমিটার জায়গায় কয়েক হাজার চারা উৎপাদন করা যায় । অনেক চারা বিক্রয়ের উপযোগী করতে মাত্র ৩/৪ সপ্তাহ সময় লাগে । আগাম চারা উৎপাদন করতে পারলে লাভও

কয়েকগুন বেড়ে যায়। একটি ভাল নার্সারি থেকে অল্প সময়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়। তাই নার্সারি স্থাপন করে নিজে লাভবান হওয়া যায়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা যায় এবং দেশকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলা যায়। আরও যেসব কারণে নার্সারি অপরিহার্য তাহলো-

১. বিভিন্ন বয়সের চরা বিপণন ও বিতরণে সুবিধা হয়।
২. সময়মতো উন্নতমানের সুস্থসবল ও বড় চারা পাওয়া যায়।
৩. স্বল্পব্যয়ে অনেক চারা পাওয়া যায়।
৪. কম পরিশ্রম ও কম খরচে চারা উৎপাদন করা যায়।
৫. অনেক চারা একসাথে পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।
৬. এমন অনেক বীজ রয়েছে যেগুলো গাছ থেকে ঝরে পড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপন করতে হয়। এসব প্রজাতির জন্য নার্সারি একান্ত অপরিহার্য। যেমন- গর্জন, শাল, রাবার, তেলসুর প্রভৃতি

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নার্সারির অবদান

১. নার্সারি ব্যবসা করে অনেক লোকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।
২. নার্সারিতে উৎপাদিত চারা দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি বনায়ন করা হয়।
৩. নার্সারিতে বনজ, ফলজ ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়। এর ফলে বৃক্ষায়ন বৃদ্ধি পায়।
৪. উপকূলী সবুজ বেষ্টনী তৈরিতে নার্সারিতে উৎপন্ন চারা রোপন করা হয়।
৫. নার্সারিতে কাজ করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

বন নার্সারির ধরন

নার্সারি বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন-

১. মধ্যম ভিত্তিক নার্সারি
২. স্থায়িত্ব ভিত্তিক নার্সারি
৩. অর্থনৈতিক ভিত্তিক
৪. ব্যবহার ভিত্তিক

১. মাধ্যমভিত্তিক নার্সারি আবার দুই ধরনের

ক. পলিব্যাগ নার্সারি

এ ধরনের নার্সারিতে পলিব্যাগে চারা তৈরি করা হয়। পলিব্যাগ সহজে সরানো যায় বলে চারা খরা, বৃষ্টি ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা যায়। গাছ থেকে গাছে সংক্রমণ কম হয়। এ পদ্ধতিতে নিবিড়ভাবে চারার যত্ন নেওয়া যায়।

খ. বেড নার্সারি

নার্সারি তৈরির ও পদ্ধতিতে সরাসরি মাটিতে বেড তৈরি করে চারা উৎপাদন করা হয়। এ নার্সারিতে এক সাথে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক চারা তৈরি করা যায়। ফলে বীজের অপচয় কম হয়। দ্রুত বর্ধনশীল চারা উৎপাদন ভালো হয়। কাটিং ও মোথা থেকে চারা উৎপাদন সহজ হয়। চারা উৎপাদন বেডের মাটি উর্বর হতে হয়।

২. স্থায়িত্ব ভিত্তিক নার্সারি দুই ধরনের যেমন-

ক. স্থায়ী নার্সারি ঃ এ ধরনের নার্সারিতে বছরের পর বছর চারা উত্তোলন করার সুযোগ থাকে। স্থায়ী নার্সারির সুবিধা হলো নার্সারির জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন করা যায়। গ্রিন হাউজ ও বীজাগার নির্মাণ করা যায় তবে মূলধনের প্রয়োজন বেশি হয়। চারার পরিবহন খরচ বেশি হয়।

খ. অস্থায়ী নার্সারি ঃ এ নার্সারিতে চাহিদা অনুযায়ী চারা উৎপাদন করা হয়। অসুবিধাটা হলো এ ধরনের নার্সারি সংরক্ষণের বেগ পেতে হয়।

৩. অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নার্সারি দুই ধরনের যেমন-

ক. গার্হস্থ্য নার্সারি ঃ এ প্রকারের নার্সারী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে স্বল্পজায়গায় ব্যক্তি তার নিজ বাড়িতে তৈরী করে থাকে। এতে ব্যক্তি তার প্রয়োজনঅনুযায়ী ফুল, ফল বা বনজ চারা উত্তোলন করে।
খ. ব্যবসায়িক নার্সারি ঃ ছোট চারা বা কলমের চারা উত্তোলন করে বিক্রয়ের জন্য যে নার্সারী স্থাপন করা তাকে ব্যবসায়িক নার্সারী বলে।

৪. ব্যবহার ভিত্তিক নার্সারি
উদ্ভিদের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের নার্সারি করা হয়। যেমন- মেহগনি, সেগুন, রেইনট্রি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য তৈরি নার্সারি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন প্রকার বন নার্সারির গঠন ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা পূর্বক একটি তালিকা প্রস্তুত করে নিজ শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন কর।

সারসংক্ষেপ

সুস্থসবল ও সুন্দর চারা পেতে অবশ্যই নার্সারি প্রয়োজন। এছাড়াও কৃষক নার্সারির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক উপকৃত হতে পারেন। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশ সেহেতু গাছপালা রোপণ ও পরিচর্যার বিষয় সবার কমবেশি ধারণা আছে। তাই নার্সারিতে বিনিযোগ একটি সহজ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। জমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি দেখতে হবে সেটি হলো সুনিষ্কাশিত ও উঁচু জমি নির্বাচন করা। যাতে পানি জমে না থাকে। দোআঁশ মাটি নার্সারি বেড তৈরিতে উত্তম। প্রচুর পরিমাণে আলো বাতাস আছে এমন জমি নার্সারির জন্য বেশ উপযোগী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। পলিব্যাগ নার্সারি কোন ধরনের নার্সারির অর্ন্তগত-
ক) বেড নার্সারি খ) মধ্যমভিত্তিক গ) স্থায়িত্ব নার্সারি ঘ) গার্হস্থ্য নার্সারি

২। ব্যবহার ভিত্তিক নার্সারির উৎপাদিত চারা নিম্নের কোন উদ্ভিদের বীজ হতে উৎপাদন করা হয়?
ক) সেগুন খ) বেত গ) ফলের গাছ ঘ) ঔষধি উদ্ভিদ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও

রহিম সাহেব তার নার্সারিতে বিভিন্ন ধরনের বনজ চারা উৎপন্ন করে থাকেন। পারিবারিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় ফলের চারা ও কাঠের চারাও তৈরি করেন।

৩। স্থায়িত্ব ভিত্তিক নার্সারির জন্য কোনটি সঠিক?
ক) সঠিক স্থান নির্বাচন করা যায় খ) মূলধন কম লাগে
গ) চারা পরিবহন খরচ কম ঘ) সারা বছর চারা পাওয়া যায় না

৪। পারিবারিক প্রয়োজনে ফলের চারা ও কাঠের চারা তৈরি হয়?
ক) ব্যবহার ভিত্তিক নার্সারি খ) আস্থায়ী নার্সারি গ) পলিব্যাগ নার্সারি ঘ) গার্হস্থ্য নার্সারি

পাঠ-১২.৫ বন নার্সারির বীজ ও চারা উৎপাদন কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বন নার্সারির বীজ ও চারা কি বলতে পারবেন।
- বন নার্সারির বীজ ও চারা উৎপাদন কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বন নার্সারির তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বন নার্সারির ভালো বীজ ও চারার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বনজ উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বীজ, বাছাই, পড, ক্যাপসিউল, বীজ সংরক্ষণ, নার্সারি বেড

বন নার্সারির বীজ

বনজ উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বীজ হলো উদ্ভিদের প্রধান বংশ বিস্তারকে উপকরণ। ভালো চারা পেতে ভালো বীজ প্রয়োজন। এ জন্য নির্দিষ্ট গুণাগুন সম্পন্ন মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ আহরণ থেকে রোপনের পূর্ব পর্যন্ত সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হলে বীজ পোকা-মাকড়, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি দিয়ে আক্রান্ত হয়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। তাছাড়া বীজ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এর গুণাগুণ নির্ণয় করতে হবে। বীজকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করণের পর বাজারজাতকরণ ও বিতরণ করা দরকার। এ পাঠে আমরা নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ, পদ্ধতি, বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি, বীজ পরীক্ষা ও বীজ বপন পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে জানব।

মাতৃগাছ নির্বাচন ঃ মধ্য বয়সী, সুস্থসবল, রোগমুক্ত এবং অধিক ফল উৎপাদনকারি গাছকে নির্বাচন। নির্বাচিত এসব গাছ থেকে উপযুক্ত সময়ে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের দেশে বীজ মাতা গাছ এক বা একাধিক উৎস হতে শনাক্ত করে বীজ সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

১) নিজ ও অন্য এলাকার কৃষকের বাড়ি
২) পার্ক বা বাগান এলাকা বা বনাঞ্চল
৩) রাস্তার পাশের বৃক্ষ
৪) বিভিন্ন স্থায়ী নার্সারি, প্রভৃতি ভালো চারা উৎপাদনের জন্য উত্তম গুণাগুণ সম্পন্ন মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা অপরিহার্য।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি

সাধারণত দুইভাবে গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

- ভূমি হতে বীজ সংগ্রহ ঃ বীজ পাকার পর যখন কিছু বীজ মাটিতে পড়ে তখন বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। বীজ পাকার মধ্যবর্তী সময়ে এ বীজ সংগ্রহ করতে হয়। যেসব গাছের ফল পেকে ফাটে না এবং বীজ ছড়িয়ে পড়ে না সেসব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। সেগুন, গর্জন, শাল, কদম, পিতরাজ, তেলসুর প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ ভূমি থেকে সংগ্রহ করা যায়।

- গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহ ঃ এ পদ্ধতিতে বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যখন ফল পরিপক্ক হবে তখন দা বা ছুরি দিয়ে গাছের ছোট ছোট ডাল কেটে সরাসরি গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করা হয়। ছোট ছোট বীজ যা মাটিতে পড়লে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় ফলে মাটিতে হতে সরাসরি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সে সব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

ক) পড জাতীয় - বাবুল, কড়ই, খ) ক্যাপসিউল-মেহগনি, চাম্পা, গ) কোন-পাইন।

গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহের পর রোদে শুকাতে হবে। এরপর পড, ক্যাপসুল বা কোন ফাটিয়ে বীজ পৃথক করতে হবে।

বীজ নিষ্কাশন ঃ ফল সংগ্রহ করার পর বীজগুলোকে শাস, আবর্জনা, খোসা ইত্যাদি থেকে পৃথক করাই হলো বীজ নিষ্কাশন। বীজ নিষ্কাশনের প্রধান তিনটি পদ্ধতি হলো-

১. বাছাই পদ্ধতি ঃ যে সব গাছের অঙ্কুরোদগমকাল সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ ৪-৭ দিন, এসব ক্ষেত্রে বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার হয়। এসব গাছের গোটা ফলই বীজ হিসাবে বপন করা হয়। যেমন-নারিকেল, গর্জন, শাল, সেগুন বীজ রৌদে শুকালে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে।
২. শুকনো পদ্ধতি ঃ জারুল, তুলা, ইপিল-ইপিল, মেনজিয়াম, বাবলা মেহগনি, কড়ই গাছের বীজ শুকনো পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। গাছ থেকে ফল পেড়ে ভালো করে রোদে শুকাতে হয়। ফল ফেটে যখন বীজ বেরিয়ে আসে, তখন মাড়াই করে বীজ নিষ্কাশন করা হয়।
৩. পচন পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে ফল পানিতে পচানোর পর বীজ বের করা হয়। যেমন- আম, কাঁঠাল, তেঁতুল, পেয়ারা ইত্যাদি তার পরে বাতাসে শুকাতে হয়।

বীজ সংরক্ষণ ঃ

গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর পরবর্তী বপন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা হয়। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ না করলে বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। যেমন- গর্জন, শাল, সেগুন, চাপালিশ, তেলসুর প্রভৃতি গাছের বীজ গুদামজাত করলে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হাস পায়। এসব গাছের বীজ ২৪ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই বপন করতে হবে। বীজ অপেক্ষাকৃত হালকা করে ছিটিয়ে গুদামজাত করা আবশ্যক। বীজ সব সময় শুকনো রাখতে হবে। অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে বীজ রাখতে হবে। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বীজ খোলা অবস্থায় রাখা হয়। আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এবং রেফ্রিজারেটর এ বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

বন নার্সারি তৈরির কৌশল

স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় নার্সারি তৈরির জন্যই প্রয়োজন সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও কিছু নিয়মনীতি।

স্থায়ী নার্সারি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চারা উৎপাদনের জন্য স্থায়ী নার্সারি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বন বিভাগ, হর্টিকালচার, বিএডিসির উদ্যান, প্রাইভেট নার্সারি কেন্দ্রগুলো স্থায়ী নার্সারি। স্থায়ী নার্সারি স্থাপনের বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো।

১. স্থান নির্বাচন ঃ আলো বাতাসপূর্ণ খোলা মেলা উঁচু ভূমি হবে। বর্ষার পানি উঠে না এবং জলাবদ্ধাতা হয় না এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। উর্বর বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি সম্পন্ন হবে। উন্নত যোগাযোগ ও পানির সুষ্ঠ ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্ত জমি ও শ্রমিক পাওয়া যায় এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

২. নার্সারির জায়গার পরিমাণ নির্ণয় ঃ এক বর্গমিটার সীড বেড বা পট বেডের জায়গা নির্ণয়

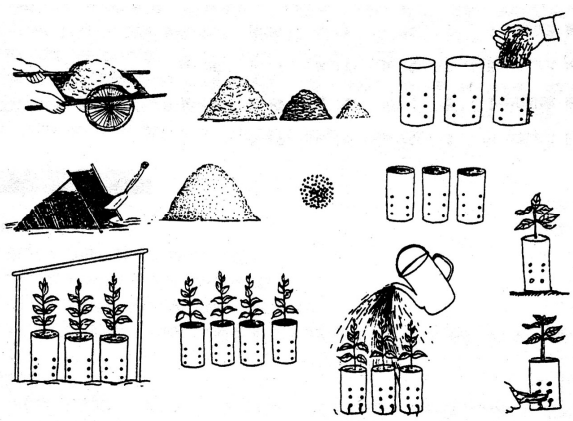

চিত্র: ১২.৫.১: চারা উৎপাদন কৌশল

পলিব্যাগের আকার	প্রতি বগ মিটারে চারার সংখ্যা
১৫ সে.মি.× ১০ সে.মি. ১৮ সে.মি.× ১২ সে.মি. ২৫ সে.মি.× ১৫ সে.মি.	৬৫ টি ৪৫ টি ২৬ টি
সীড বেডে শিকড় চারা হতে চারার দূরত্ব	প্রতি বর্গ মিটারে চারার সংখ্যা
৫ সে.মি.× ৫ সে.মি. ১৮ সে.মি.× ১২ সে.মি. ২৫ সে.মি.× ১৫ সে.মি.	৪০০ টি ২০০ টি ১০০ টি

৩. বেড নির্মাণ ঃ অনিষ্টকারী জীবজন্তুও পথচারীদের হাত থেকে চারা গাছ রক্ষা করার জন্য বেড়া দেওয়া দরকার। স্থায়ী নার্সারিতে বেড়া দেওয়ার উপায়ক -

ক) ইটের দেয়াল ঃ স্থায়ী নার্সারির চার দিকে উঁচু ইটের দেয়াল নির্মাণ করে বেড়া দেওয়া যায়।

খ) কাঁটা তারের বেড়া ঃ স্থায়ী নার্সারিতে কাঁটা তারের বেড়া সহজে দেওয়া যায়।

গ) লোহার জালের বেড়া ঃ লোহার জাল খুঁটির সাথে বেঁধে দিয়ে বেড়ার পাশ দিয়ে জীবন্ত গাছ লাগানো যেতে পারে। কাঁটা তারের বেড়ার মতো এ বেড়াতেও তিন ধরনের খুঁটি ২ মিটার অন্তর অন্তর ব্যবহার করা যায়।

ঘ) জীবন্ত গাছের বেড়া ঃ দূরন্ত, কাঁটা মেহেদী, মেন্দী, ঢোল কলমী প্রভৃতি জীবন্ত গাছ দিয়ে নার্সারির চার দিকে স্থায়ী বেড়া দেওয়া যায়।

৪. ভূমি উন্নয়ন

নার্সারি স্থান নির্বাচনের পর পরই উন্নয়নের কাজ করতে হয়। নার্সারি বেড় তৈরির স্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে। মাটি তৈরির সময় বৃষ্টি বা সেচের পানি যাতে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য মাটি ঢালু ও ডেন করতে হবে। ভূমির মাটি দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ হতে হবে।

৫. অফিস ও আবাসিক এলাকা

নার্সারির অফিস ঘরটি প্রধান রাস্তার পাশে মূল গেটের কাছে অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন। অফিস ও আবাসিক এলাকা চারা উৎপাদন এলাকার বাইরে রাখতে হবে। নার্সারি এলাকার ভিতরে আবাসন ঠিক নয়।

৬. বিদ্যুতায়ন ঃ স্থায়ী নার্সারিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা ভালো। এতে নার্সারি রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা হয়।

৭. রাস্তা ও পথ নার্সারিতে প্রবেশের জন্য একটি প্রধান রাস্তা থাকা আবশ্যক। প্রধান রাস্তাটি পরিকল্পিতভাবে নার্সারির ভিতরের পথগুলোর সাথে যুক্ত থাকবে।

৮. সেচ ব্যবস্থা নার্সারিতে চারা উত্তোলনের জন্য পানি প্রয়োজন। সে জন্য নার্সারি স্থাপনের শুরুতেই উত্তম সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নর্দমা ও নালা ঃ নার্সারিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এ কারণে প্রয়োজনীয় নর্দমা ও পার্শ্বনালার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০. নার্সারি ব্লক ঃ নার্সারির চারা উত্তোলনের স্থানকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্লককে আবার কয়েকটি সীড বেড বা পট বেডে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্লকে ১০-১২ টি বেড থাকতে পারে। গ্রিন হাউজ সেড রাখার জায়গা, কমপোস্ট তৈরির গর্ত, মাটি রাখার স্থান ইত্যাদিও সুবিধামতোভাবে বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করে দিতে হবে।

১১. নার্সারি বেড : বেড সাধারণত দুই রকম হতে পারে-

ক) সরাসরি বীজ বপন করে চারা উত্তোলনের জন্য বেডঃ এ জন্য জমি ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। জমির মাটির কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে করতে হবে। সব রকম আগাছা নুড়ি পাথর পরিষ্কার করে ভালো করে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। অতঃপর জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ১ মিটার ৩ মিটার ২০ সেমি আকারে বেড তৈরি করতে হবে। বেড তৈরির পর প্রয়োজনীয় গোবর বা কমপোস্ট ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে কয়েকদিন রেখে দেওয়ার পর বীজ বপন করতে হবে।

খ) পলিব্যাগে চারা উত্তোলনের জন্য বেড তৈরি ঃ এক্ষেত্রে মাটিতে চাষ করার প্রয়োজন নেই। কেবল দুটি বেডের মধ্যবর্তী স্থানের মাটি তুলে বেডকে ১০-১৫ সে.মি. উঁচু করে উপরিভাগ সমান করতে হয়। এরপর বেডের ধার তৈরি করা হয়। তবে নার্সারি স্থানের প্রযোজ্যতা অনুযায়ী বেডের আকার ছোট বড় হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	দল ভিত্তিক (পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট) শিক্ষার্থীরা স্থানীয় একটি নার্সারি পর্যবেক্ষণ কর এবং কিভাবে মাতৃগাছ নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি ও বন নার্সারি তৈরি করা হয়; সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে ক্লাসে উপস্থাপন কর।

সারসংক্ষেপ

নার্সারিতে ভাল চারা উৎপাদন করার জন্য প্রথমে প্রয়োজন ভাল বীজ। এক্ষেত্রে মধ্য বয়সী, সুস্থসবল, রোগমুক্ত এবং অধিক ফলনশীল মাতৃগাছ নির্বাচন করা অতীব জরুরি। পাশাপাশি উপযুক্ত উপায়ে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর পরবর্তী বপন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ ব্যতীত বীজের আশানুরূপ মান পাওয়া সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। বীজ নিষ্কাশনের প্রধান পদ্ধতি কয়টি?

ক) ২ খ) ৩

গ) ৪ ঘ) ৫

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও

উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত "হারুন বনজ নার্সারির" মালিক জনাব হারুন মিয়া। তিনি পলিব্যাগে অধিকাংশ চারা উৎপাদন করে থাকে। এক্ষেত্রে তিনি বীজ অপচয় ও পচন পদ্ধতিতে বীজ নিষ্কাশনের প্রতি বিশেষ নজর রাখেন।

২। ১৫ × ১০ সে.মি. আকারের পলিব্যাগের প্রতি বর্গমিটার চারার সংখ্যা কতটি

ক) ৭২টি খ) ৬৫ টি

গ) ৫০ টি ঘ) ৪০ টি

৩। পচন পদ্ধতিতে বীজ নিষ্কাশন করা হয় কোনটির?

ক) তুলা খ) জারুল গ) আম ঘ) শাল

পাঠ-১২.৬ বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ, কাঠের পরিমাণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- তা বা কাঠ সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ।
- গোল কাঠ বা তা পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	বৃক্ষ কর্তন ও আর্বতন কাল, কাঠ চিরাই, গোল কাঠ, ভলিউম

বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ

বৃক্ষ বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠবহুল উদ্ভিদ । কাষ্ঠবহুল উদ্ভিদ যার মাটি থেকে সুস্পষ্ট শীর্ষ প্রকটতা বিশিষ্ট একটি একক প্রধান কান্ড অথবা গুঁড়ি থেকে বহুবিভক্ত অপ্রধান শাখা বিকশিত হয় তাকে বৃক্ষ বলে । কিছু লেখকের মতে পূর্ণ বিকশিত অবস্থায়বৃক্ষের ন্যূনতম উচ্চতা ৩ মিটার থেকে ৬ মিটার হওয়া উচিত । আবার কিছু লেখক গাছের কান্ডের ন্যূনতম ব্যাস নির্ধারণ করেছেন ১০ সেমি । অন্যান্য কাষ্ঠবহুল বৃক্ষ, যারা এ শর্তগুলো পূরণ করতে পারে না, যেমন শাখান্বিত প্রধান কান্ড অথবা ছোট আকৃতির গাছকে গুল্ম বলা হয় । অন্যান্য উদ্ভিদের তুলনায়বৃক্ষ দীর্ঘজীবী হয়, কোন কোন গাছ হাজার বছরও বেঁচে থাকে এবং ১১৫ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে । অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যেমন বৃক্ষ রোপণ করতে হয় তেমনি একই কারণে বৃক্ষ কর্তন করতে হতে পারে । সাধারণত গাছের আবর্তনকাল শেষ হলে গাছ কর্তন করা হয়ে থাকে । গাছ কাটা ও তা থেকে কাঠ সংগ্রহ করার বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । এ জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিগত কৌশল জানা দরকার । এ পরিচ্ছেদে আপনি বৃক্ষ কর্তনের সময় ও নিয়মাবলি, তা পরিমাপ পদ্ধতি, বৃক্ষকর্তন ও কাঠ সংরক্ষণের উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও দক্ষতা অর্জন করবেন ।

বৃক্ষ কর্তন সময় বা আবর্তনকাল

পরিপক্ক হওয়ার আগেই বৃক্ষ কর্তন করলে ভালো মানের কাঠ পাওয়া যায় না । বৃক্ষের চারা রোপণ থেকে শুরুকরে যে সময়ে বৃক্ষের বৃদ্ধি সর্বাধিক হয় এবং গাছ পরিপক্কতা লাভ করে ব্যবহার উপযোগী হয়, সে সুনির্দিষ্ট সময়কালকে আবর্তনকাল বা কর্তন সময় বলে । বন ব্যবস্থাপনায় বৃক্ষের আবর্তনকালকে তিন ভাগে বাগ করা হয়ে থাকে । যথা-

১ । দীর্ঘ আবর্তনকাল ঃ জাতীয় কাঠ ও ধীর বর্ধনশীল প্রজাতিসমূহ শুধুমাত্র, কাঠ উৎপাদনের জন্য ৪০-৫০ বছর আবর্তনকালে কাটা হয় । যেমন- মেহগনি, গর্জন, জারুল, শীলকড়ই, সেগুন,জাম, তেলসুর, চাপালিশ, কাঠাল, শাল, ইত্যাদি ।

২ । মাঝারি আবর্তনকাল ঃ আংশিক কাঠ প্রদায়ি প্রজাতিসমূহ খুঁটি ও কাঠের উৎপাদনের জন্য ২০-৩০ বছর আবর্তনকালে কাটা হয় । যেমন- চন্দন, শিশু, রেন্ডি, খয়ের কড়ই, গামার, হরতকী, ছাতিয়ান ইত্যাদি ।

৩ । স্বল্প আবর্তন কাল ঃ যে সব গাছের কাঠ নরম এবং দুত বর্ধনশীল জ্বালানি কাঠ, পশু খাদ্য ও মন্ড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, সেসব উদ্ভিদের কর্তন সময় কম হয় । যেমন- বাবলা, কদম, কেওড়া, বাইন, শিমুল, আকাশমনি, তেলিকদম, ঝাউ ইত্যাদি ।

বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি ঃ

১। গাছ কাটার পূর্বে ডালপালা ছেটে নিয়ে গাছ নিয়ন্ত্রিতভাবে ফেলতে সুবিধা হয়।

২। যতটা সম্ভব গাছ মাটির কাছাকাছি কাটতে হবে। কারণ গাছের গোড়ার অংশটা বেশি মোটা হয়। এ অংশে কাঠের মানও ভালো থাকে।

৩। গাছ সব সময় করাত দিয়ে কাটতে হবে। এতে কাঠের অপচয় পুরাপুরি রোধ করা সম্ভব। প্রথমে যে দিকে গাছকে ফেরতে হবে সেদিকে করাত দিয়ে কাটতে হবে।

৪। কাটা অংশে খিল বা কাঠের টুকরা ঢুকিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে আগের মতোই বিপরীত দিকে করাত দিয়ে কাটতে হবে। এতে গাছ কাঙ্খিত দিকে পড়বে। কাটা গাছ মাটিতে পড়ার পর খন্ডিত করতে হবে। তবে কী কাজে কাঠ ব্যবহার করা হবে তার ভিত্তিতে পরিমাপ নির্ধারিত করতে হবে। খন্ডিত গোল অংশকে বলা হয় লগ। এ লগকে করাত কলে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার উপযোগী চিরাই কাঠে পরিণত করা হয়। চেরাই কাঠের দৈর্ঘ, প্রস্থ ও পুরুত্ব থাকে। চেরাই কাঠের প্রস্থ ১৫ সে.মি. এর বেশি হলে এবং পুরুত্ব ৪ সে. মি. হলে তাকে বলা হয় তক্তা।

৫. গাছ কাটার সময় যে দিকে গাছ পড়বে প্রথমে কুড়াল দিয়ে মাটির ১০ সে.মি. উপরে সেই দিকে দুই-তৃতীয়াংশ কাটতে হবে। পরবর্তীতে কাটা হবে ঠিক এ কাটার বিপরীত দিকে ১০ সে.মি. উপরে। এভাবে গাছ কাটলে গাছকে সুনির্দিষ্ট দিকে ফেলা সম্ভব হয়। এতে পার্শ্ববর্তী গাছের ক্ষতি কম হয়। কুড়াল/করাত উভয় ব্যবহার করে গাছ কাটা বেশ সুবিধা জনক।

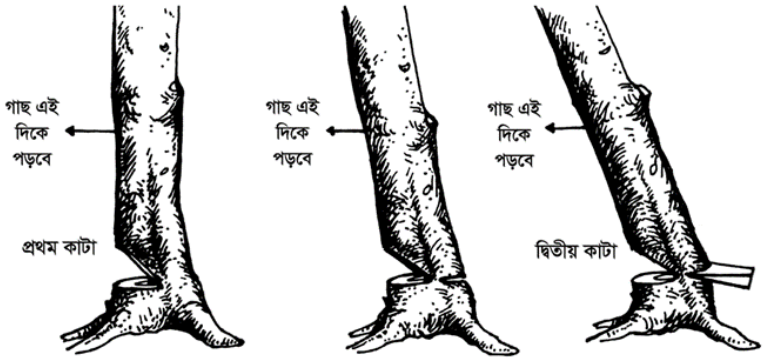

চিত্র :১২.৬.১: গাছ কাটার দৃশ্য

গোল কাঠ ও চিরাই কাঠের পরিমাণ পদ্ধতি ঃ

গাছ কাটার পর যদি সে গাছকে খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা না হয় তবে তা চিরাই করতে হবে এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাপের কাঠ বের করতে হবে। গোলকাঠের বা লগের সঠিক আয়তন বা ভলিউম নিউটনের সূত্রের সাহায্য বের করতে হয়।

সূত্রটি এরূপ ঃ

$$\text{ভলিউম} = ০.০৮ \times \frac{(\text{বেড ১})^২ + ৪ \times (\text{বেড ২})^২ + (\text{বেড ৩})^২}{৬}$$

এখানে, বেড় ১ = চিকন প্রান্তের বেড়

বেড় ২ = লগের মাঝখানের বেড়

বেড় ৩ = মোটা প্রান্তের বেড়

উদাহরণ ঃএকটি শালগাছের লগ ৬ মিটার দীর্ঘ। এটির চিকন মাথার বেড় ১.৫০ মিটার, মাঝখানের বেড় ২.০ মিটার এবং মোটা মাথার বেড় ২.৫ মিটার। লগটির সঠিক আয়তন বা ভলিউম কত?

সমাধান : ভলিউম $= ০.০৮ \times \frac{(\text{বেড } ১)^২ + ৪ \times (\text{বেড } ২)^২ + (\text{বেড } ৩)^২}{৬}$

$= ০.০৮ \times \frac{(১.৫ + ৪ \times ২) + ২.৫}{৬} \times ৬$ ঘনমিটার

$= ০.০৮ \times \frac{১২}{৬} \times ৬$ ঘনমিটার

ভলিউম = ০.৯৬ ঘনমিটার

তক্তা বা চেরাই কাঠের ভলিউম মাপা সহজ। চেরাই কাঠ/তক্তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পুরুত্ব জানা থাকলে অতি সহজেই এর ভলিউম বের করা যায়। একটি পরিমাফ ফিতার সাহায্যে অতি সহজেই এক খন্ড চেরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব মাপা যায়। তারপর নিম্বের সূত্রের সাহায্যে ভলিউম নির্ণয় করা যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি গোল কাঠ ও চিরাই কাঁঠ নিয়ে দল গঠন ভিত্তিতে উহার পরিমাণ নির্ণয় কর ও উপাত্তসমূহ খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

সারসংক্ষেপ

সঠিক উপায়ে ও উপযুক্ত সময়ে বৃক্ষ কর্তনের ফলে উন্নত মানের কাঠ পাওয়া সম্ভব। বৃক্ষ কর্তনের সময় ও নিয়মাবলি, কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি, কাঠ পরিমাপ পদ্ধতি ও কাঠ সংরক্ষণের বিভিন্ন কৌশল আমাদের বাস্তবিক জীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। গাছের গোড়ার অংশের কাঠ অপেক্ষাকৃত ভাল মানের হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

১। সিসিএ দ্রবণে ক্রোমিক অক্সাইডের পরিমাণ কত?

ক) ৪৭.৫% খ) ৩৭.৫% গ) ৮৯.৫% ঘ) ৪১.৫%

২। কাঠ শুকালে এর আয়তনের কি রূপ পরিবর্তন হয়?

ক) কমে খ) বাড়ে গ) অপরিবর্তিত থাকে ঘ) কোনটিই নায়

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও

নোমান সিজনিং পদ্ধতিতে কাঠের আর্দ্রতা কমিয়ে তা সংরক্ষণ করা ব্যবস্থা নিলেন। কিছু দুই বছর পর তিনি কাঠের ভিতর পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারলেন।

৩। সিজনিং পদ্ধতিতে কাঠের আর্দ্রতা কি পরিমাণ কমে?

ক) ১২% খ) ২০% গ) ২৫% ঘ) ৩০%

৪। মাটির কত সেমি উপরে গাছ কাটলে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাঠ পাওয়া যাবে?

ক) ৭ খ) ১০ গ) ৬ ঘ) ৯

পাঠ-১২.৭ কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তক্তা বা কাঠ সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কাঠ সিজিনিং ও টিটমেন্ট কি বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সিজনিং, টিটমেন্ট, ঘৃনপোকা, এয়ার ডাইং, সিসিএ, কিলন পদ্ধতি

কাঠ সংরক্ষণ মানুষের জীবন যাত্রার ধরনের উপর নিভরশীল। আসলে সৃজনশীলভাবে কাঠ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক ভাবে কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিল। যখন কাঠ সিজনিং ও টিটমেন্ট পদ্ধতি ছিলনা তখন মানুষকে কাঠ সংরক্ষণের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হত। প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় আমাদেরকে কাঠ সংরক্ষণের জন্য এখন এত কষ্ট করতে হয় না। কাঠের স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করার জন্য কাঠকে ব্যবহার উপযুক্ত করা বা সিজনিং করা হয়। বাঁশের স্থায়ীত্ব দীর্ঘায়িত করার জন্যও সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করার প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় কাঠ বা বাঁশকে সিজিনিং করে কর্তিত কাঠ বা বাঁশের গুণগতমান ও স্থায়ীত্বকাল বেশ কয়েকগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ পাঠে আপনি কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি ও কাঠ সংরক্ষণের উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

কাঠ সিজনিং ও টিটমেন্ট

ভিজা বা কাঁচা কাঠ থেকে আর্দ্রতা অপসারণ অথবা কাঠ শুষ্ককরণ হল কাঠ সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট। আর্দ্রতা কাঠের অভ্যন্তরে মুক্ত পানি হিসেবে অথবা কোষপ্রাচীরে রাসায়নিকভাবে আবদ্ধ পানি হিসেবে থাকে। আর্দ্রতার পরিমাণ ৩০ শতাংশের বেশি হলে সে কাঠকে সাধারণত কাঁচা কাঠ বলা হয়। জীবন্ত অবস্থায় বৃক্ষের জন্য পানি অপরিহার্য হলেও কাটার পর কর্তিত বৃক্ষে পানির পরিমাণ যত কম থাকবে কাঠ তত বেশি টিকবে। পানির পরিমাণ যদি কাঠ ওজনের ১২% এ নামিয়ে আনা যায় তাহলে ধরে নিতে হবে কাঠের গুণগত মান সর্বোত্তম হবে। সিজনিং বা টেকসইকরণে কাঠের গুণগত মান ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। উপযুক্ত সিজনিং কাঠের আয়ুষ্কাল বাড়ায় এবং ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও অণুজীবের আক্রমণ থেকে কাঠকে বাঁচায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সিজনিংয়ের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বায়ু সিজনিং , বাষ্প ও পানি সিজনিং এবং বাষ্পীয়, রাসায়নিক, সৌরভাঁটি ও ভাঁটি দ্বারা শুষ্ককরণ আর বুলটন সিজনিং ।
মূলত: সিজনিংকে দুইভাবে করা যায়-

১. এয়ার ডাইং

বায়ু সিজনিং পদ্ধতিতে কাঠ প্রাকৃতিক বায়ু ও তাপে খোলা জায়গায় বা ছায়ায় দীর্ঘ সময় রেখে দেওয়া হয়। এটি একটি চিরাচরিত পদ্ধতি এবং এতে বাংলাদেশের জলবায়ুতে ২৫ মিলিমিটারের অধিক চওড়া গোলাকার ও চেরাই কাঠ পুরো একটি শীত ঋতুসহ কমপক্ষে এক বছরের জন্য ফেলে রাখতে হয়। পাতলা কাঠ, তক্তা, বোর্ড, জ্বালানি কাঠ সাধারণত কেবল তাড়াতাড়ি শুকানোর জন্য সরাসরি রোদে রাখা হয়। অত্যন্ত টেকসই ও শক্ত কাঠের জন্যই বায়ু সিজনিং লাভজনক, পক্ষান্তরে হালকা কাঠ প্রায়ই ছত্রাক, পোকা ও মোল্ড দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সমানভাবে সিজনিং সম্ভব হয় না। তবে হালকা পাতলা চেরাই করা কাঠ প্রখর রোদে শুকালে কাঠ ফেটে বা বেঁকে যেতে পারে। তাই এগুলোকে মাটি থেকে ৩০-৪০ সেমি উঁচুতে ছায়ায় স্তরে স্তরে শুকাতে হয়।

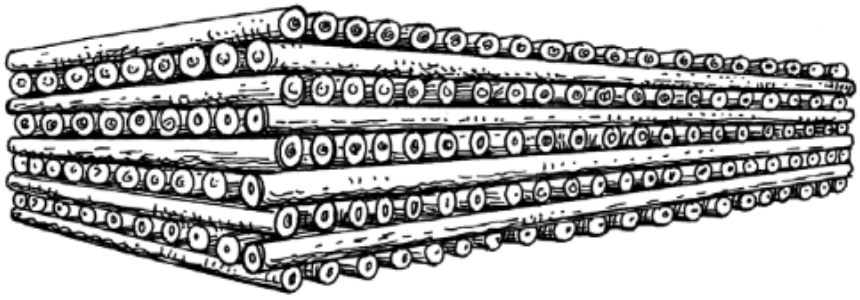

চিত্র : ১২.৭.১: এয়ার ডাইং

২. কিলন পদ্ধতি

কিলন পদ্ধতিতে একটি বড় পাকা বায়ুনিরপেক্ষ কক্ষে কাঠের তক্তার গায়ে না লাগে এবং দুটো তক্তার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। অতপর বায়ুনিরপেক্ষ কক্ষে প্রথমে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করিয়ে কাঠের পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। পরবর্তীতে তাপ প্রয়োগ করে সে কক্ষ থেকেও একই সাথে কাঠ থেকে পানি বের করে নেয়া হয়। সাধারণত বেশি কাঠ একসাথে সিজন করার জন্য কিলন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সিজনিং করে পানির পরিমাণ ১২% এ নামিয়ে আনা যায়। তবে প্রজাতিভেদে সিজনিং এর সময় কম বেশি হতে পারে।

কাঠ সংরক্ষণ

রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে কাঠ, কাঠজাত দ্রব্যাদি ও আসবাবের কাঠের ক্ষয়, পচন বা ক্ষতি রোধ করা যায়। কাঠ সাধারণত ছত্রাক (সাদা পচন, বাদামি পচন ও কোমল পচন চত্রাক), কীটপতঙ্গ, (উইপোকা, বিটল, ঘুণপোকা), সামুদ্রিক এক ধরনের ঝিনুক এবং অন্যান্য নানা প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমন কোনো একক সংরক্ষক নেই যা সংরক্ষণে সবগুলি চাহিদা মেটাতে পারে। কাঠসংরক্ষক হতে পারে তৈলজ, তরল বস্তু অথবা একটি মিশ্রণ। ক্রিয়োসোট, পেন্টাক্লোরোফেনল ও তৈলজ জৈবসংরক্ষক একসময় বাংলাদেশে কাঠের খুঁটি, খাম্বা ও রেলওয়ে স্লিপার সংরক্ষণে ব্যবহৃত হতো। আজকাল ক্রিয়োসোট শুধুই রেলওয়ে স্লিপার সংরক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে। সিসিএ নামের রাসায়নিক দব্যটি সংরক্ষণী হিসাবে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। সিসিএ সংরক্ষণটি ৩টি উপাদানের সম্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে ক্রোমিক অক্সাইড ৪৭.৫%, কপার অক্সাইড ১৮.৫%, আর্সেনিক পেন্টা অক্সাইড ৩৪। উপাদানগুলো পৃথক পৃথকভাবে কিনেও আনুপাতিক হারে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা যায়। পানিতে মিশ্রণটি ২.৫% দ্রবণ তৈরি করা হয়। দ্রবণটি বিশেষ চাপ পদ্ধতিতে কাঠের মধ্যে ঢুকানো হয়। প্রতি ঘনফুট কাঠে সাধারণভাবে ০.৪ পাউন্ড সংরক্ষণী প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠ সংরক্ষণের ৭ দিন পর ব্যবহারযোগ্য হবে। সিসিএ সংরক্ষণী দিয়ে সংরক্ষিত কাঠ পচন প্রতিরোধ করতে পারে। উইপোকার আক্রমণও প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এছাড়াও বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ধৌতকরণ, প্রলেপন, ছিটানো ও তরলে ডুবানো, ভিজানো, গরম-ঠান্ডা প্রবাহ, ব্যাপনক্রিয়া ও চাপপ্রযোগ। গোটা কাঠের উপর চাপপ্রয়োগ সংরক্ষেকের ভেদ্যতা বা রক্ষণক্ষমতার দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠের অভ্যন্তর প্রথমে বায়ুশূণ্য করে সংরক্ষক দ্রবণে চাপ দিয়ে তা কাঠের শূণ্য কোষগুলিতে ভরাট করা হয়।

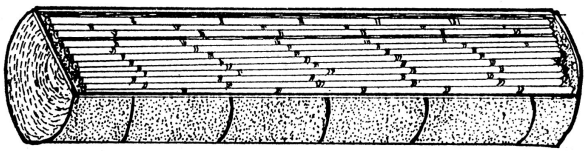

চিত্র:১২.৭.২: চুবানো পদ্ধতি

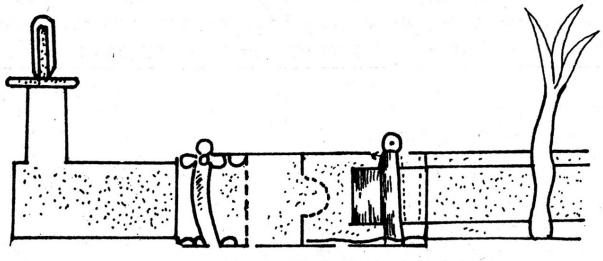

চিত্র: ১২.৭.৩: প্রাণরস বিচ্যুতি পদ্ধতি

বৃক্ষ কর্তন সংরক্ষণের উপযোগিতা

গাছ লাগানো ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিচর্যার মাধ্যমে সেগুলো বড় করে তোলার পিছনে নানা উদ্দেশ্যে থাকে। তবে যে উদ্দেশ্যেই গাছ লাগানো হোক না কেন সুনির্দিষ্ট আবর্তনকাল শেষে পরিপক্কতা লাভ করলে গাছ কর্তন করাই শ্রেয়। কারণ নির্দিষ্ট সময় পরে গাছের কাঠের মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় গাছের বাকল ফেটে বা রোগাক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে কান্ডের অভ্যন্তর ভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। তাছাড়া গাছ কখন কাটতে হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন-

১। কাঠ দিয়ে কী করা হবে?
২। কোন পরিমাপের কাঠ প্রয়োজন?
৩। কী মানের কাঠ প্রয়োজন?
৪। এখনই টাকার প্রয়োজন কিনা?
৫। গাছ আরও বড় হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা ডালপালায় ছেয়ে যেতে পারে কিনা?
৬। ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে বা গাছ উপড়ে স্থাপনা বা জানমালের ক্ষতির কারণ হতে পারে কিনা?
৭। গাছ কোন বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা?
৮। গাছের আবর্তন কাল শেষ হয়েছে কিনা?

যে কারণেই গাছ কাটা হোক না কেন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনে কাটতে হবে। গাছ ও সঠিক নিয়মে কর্তন এবং খন্ডিত করণের মাধ্যমে অপচয় রোধ করা যায়। আর ব্যবহারের আগে বিজ্ঞান সম্মত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। বৃক্ষ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। কোনো বন এলাকায় বছরে কী পরিমাণ কাঠ বৃদ্ধি পায় সব সময় তার চেয়ে কম কাঠ আহরণ করতে হবে। এর ফলে বনজ সম্পদ সংরক্ষিত হয়।

কাঠের পোকা

কাঠের পোকার ক্ষতিসাধন থেকে প্রতিরোধের উপায় হল কাঠে সংরক্ষণমূলক ঔষুধ প্রয়োগ, কীটনাশক, ছিটানো, পালিশ লাগিয়ে ভৌত বাধা সৃষ্টি, কাঠ দ্রুত কেঁটে নিয়ে শুকানো, পানিতে জাগ দেওয়া, কীট প্রতিরোধক কাঠ ব্যবহার ইত্যাদি। ঘুণপোকা (Heterobostrychus, Sinoxylon, Dinoderus) (Bostrychidae: Coleoptera) শুষ্ক কাঠ আক্রমণ করে। এগুলি শুধু শ্বেতসারপ্রধান কোমলকাঠ ছিদ্র করে এবং কাঠ ময়দার মতো মিহি গুঁড়োয় পরিণত করে। Hoplocerambyx spinicornis I Batocera (Cerambycidae: Coleoptera) নামের লম্বা অ্যানটিনাবিশিষ্ট কতিপয়পোকা কাঠের ভিতরে ছিদ্র করে এবং এ ছিদ্র করা সুড়ঙ্গগুলি সাধারণত কাঠের গুঁড়োয় ভরে থাকে। কার্পেন্টার বী (Carpenter bee) নামে পরিচিত Xylocopa (Sylocopidae: Hymenoptera) বাসা তৈরীর জন্য কাঠে সুড়ঙ্গ বানায়। বেশ কিছু প্রজাতির উইপোকা মাটিতে ফেলে রাখা, গুদামজাত অথবা ব্যবহৃত হচ্ছে এমন কাঠ আক্রমণ করে প্রচুর ক্ষতি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন প্রকার কাঠ সংরক্ষণ কৌশল শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন কর। কাঠে ক্ষতি করে এমন পাঁচটি পোকার নাম লিখ।

সারসংক্ষেপ

কাঠ টিট্‌মেন্টের অন্যতম উদ্দেশ্য হল কাঠকে পচন ও নষ্টের হাত হতে রক্ষা করা। এক্ষেত্রে সিসিএ রাসায়নিক দ্রবটি আমাদের দেশে অতি পরিচিত। এর মাধ্যমে কাঠকে আপনি ঘুনপোকা, কার্পেন্টার বী, ক্ষতিকর আর্থ্রোপোডা ও কীটপতঙ্গ ইত্যাদি হতে সহজে মুক্ত রেখে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কাঠ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আর্দ্রতা শতকরা কত হলে তা সর্বোত্তম হবে?

ক) ১২% খ) ১৩%

গ) ১৪% ঘ) ১০%

২। কোনটি কাঠ সংরক্ষণের পদ্ধতি নয়?

ক) এয়ার ড্রাইং খ) কিলন ড্রাইং

গ) ফায়ার ড্রাইং ঘ) সিজনিং

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও

এয়ার ডাইং, কিলন ডাইং, ফায়া ডাইং ইত্যাদি হল কাঠ সংরক্ষনের বিভিন্ন পদ্ধতি। কাঠের গুণাগুণ নষ্টকারী বিভিন্ন পোকা যেমন-ঘুনপোকা, কার্পেন্টার বী প্রভৃতির হাত হতে কাঠকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয় রাসায়নিক দ্রবাদি।

৩। এয়ার ডাইং পদ্ধতিতে কাঠ সিজনিং করতে সময় লাগে

ক) এক মৌসুমে খ) দু মৌসুম

গ) তিন মৌসুম ঘ) চার মৌসুম

৪। কাঠের ঘুনপোকা দ্বারা কাঠের কোন অংশ আক্রামন্বিত হয়?

ক) সার অংশ খ) বাকল

গ) ফ্লোয়েম ও জাইলেম ঘ) শ্বেতসার প্রধান কোমল কাঠ

৫। কাঠ সংরক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ

ক) CCA খ) Ethylene

গ) CHO ঘ) কিলন পদ্ধতি

পাঠ-১২.৮ উপকূলীয় বনায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উপকূলীয় বনায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- উপকূলীয় বনায়নে জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।
- উপকূলীয় বনায়নের জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	উপকূলীয় বনায়ন, সাইক্লোন, টর্নেডো, প্যারা বন

উপকূলীয় বনায়নের ধারণা

বাংলাদেশ বিশ্বেও সর্বপ্রথম সফল উপকূলীয় বনায়নকারী দেশ । উপকূলীয় জনগণের আরও অধিক সুরক্ষা প্রদানে জন্য বাংলাদেশ বন বিভাগ উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা নতুন চরে ১৯৬৬ সাল থেকে ম্যানগ্রোভ বনায়ন শুরু করে । বন বিভাগ কর্তৃক উপকূলীয় বনায়ণের সফলতা প্রত্যক্ষ করে সরকার উপকূলীয় ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার একর (প্রায় ৫ লক্ষ হেক্টর) এলাকা বনায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর নিকট হস্তান্তর ও বন আইনের ৪ ধারায় সংরক্ষিত ঘোষণা করেছেন । বন বিভাগ ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর (প্রায় ৫ লক্ষ একর) চরাঞ্চলে বনায়নের মাধ্যমে নয়নাভিরাম উপকূলীয় বন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম ।

উপকূলীয় বনায়নের ফলে, হাজার হাজার হেক্টর জমি চাষাবাদ এবং বসবাসের জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে । ইতিমধ্যে ১১২০৬৩ একর (প্রায় ৪৫,৩৭০ হেক্টর) জমি ফসল উৎপাদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করা হয়েছে । আরও প্রায় ৫০ হাজার এক (প্রায় ২০২৪৩০ হেক্টর) বনায়নকৃত ভূমি, ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তর করার অপেক্ষায় আছে । তাছাড়াও ম্যানগ্রোভ বনায়নের পাশাপাশি উপকূলীয় জেলাসমূহে নন-ম্যানগ্রোভ ৮৮৬০ হেক্টর, গোলপাতা ৩১৯০ হেক্টর, নারিকেল ১০ হেক্টর, এরিকা ৪০ হেক্টর, বাঁশ ও বেত ২৮০ হেক্টর, রাস্তার ধারে ৪৮৫০ হেক্টর (রূপান্তরিত) বনায়ন করা হয়েছে ।

সর্বোপরি, সবুজ বেষ্টনী হিসাবে, উপকূলীয় বন প্রত্যক্ষভাবে ঘুর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে লক্ষ লক্ষ জীবন এবং সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায় । এছাড়াও, উপকূলীয় বনায়ন নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও ভোলা উপকূলীয় জেলায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে ।

অবস্থান: নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকা । উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চর ভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃষ্টি করা হচ্ছে । এ বনকে প্যারা বনও বলা হয় । এ বন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জান-মাল রক্ষা করে । বাংলাদেশের উপকূলীয় বণাঞ্চল আছে এমন জেলার সংখ্যা ১৯টি ।

পরিমাণ: প্রায় ১,৯৬,০০০ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ১.৩৬% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ১২.৫০% ।
উদ্ভিদ প্রজাতি: কেওড়া, ছৈলা, বাইন, গোলপাতা ইত্যাদি । প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের মত এ বন জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয় ।
বন্যপ্রাণী: হরিণ, মেছোবাঘ, শিয়াল ইত্যাদি ।
বনের পাখি: কালালেজ জৌরালী, দেশি গাঙচষা, কালামাথা কাস্তেচরা, খয়রাপাখ মাছরাঙা ইত্যাদি ।

মাছঃ এ বন উপকূলীয় মৎস্য ভান্ডারেরও একটি বিরাট উৎস। ভেটকি, পারসে, গলদা, বাগদা ইত্যাদি।

চিত্র: ১২.৮.১: উপকূলীয় বনায়ন

উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি ও তা সংরক্ষণ করা গেলে বহুবিধ উপকার সাধিত হবে। উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও টর্নেডোর প্রকোপ থেকে উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষা করা। জ্বালানি ও খাদ্যের চাহিদা মোটানো, অর্থ উপার্জন, ভূমিক্ষয় রোধ ইত্যাদি প্রয়োজনের উপকূলীয় বনায়ন সৃষ্টি ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত অপিহার্য। পৃথিবী বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন হিসাবে খ্যাত এ সুন্দরবনকে রক্ষা করতে উপকূলীয় সাভানা বেষ্টনী সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই ।উপকূলীয় বনাঞ্চলের উপযোগিতা সমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নরূপ উপায়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ক) পরিবেশগত উপযোগিতা

১. ভূমির লবণাক্ততা হ্রাস করে পরিবেশ জীবকলের বাস উপযোগী করতে সাহায্য করে।

২. এ বনাঞ্চলের বৃক্ষরাজি উপকূল অঞ্চলের ভূমিক্ষয় রোধ করে। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ভূ-নিম্নস্থ পানির স্তরবৃদ্ধি করে।

৩. উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী উপকূলীয় অঞ্চলে সৃষ্টি সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও সাইক্লোনের কবল থেকে মানুষ ও জীবজন্তুকে রক্ষ করে।

৪. এ বনাঞ্চল মানুষ, পাখি, জীবজন্তু ও পোকা-মাকড়ের নিরাপদ আবাস তৈরি ও রক্ষা করে এবং খাদ্যের যোগান দেয়। ফলে অত্র এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে।

৫. ভূমিধস ও ঝড়রোধ করে এবং বৃষ্টিপাত হতে সহায়তা করে।

৬. উকূলীয় বনায়ন আমাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদক সুন্দরবন ও এর জীবজন্তুতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. পরিবেশের অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখে, উত্তাপ সৃষ্টি রোধ করে এবং বাতাস পরিশোধন করে।

খ) নান্দনিক উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের ফলে যে নির্মল সবুজ বেষ্টনী তৈরি হয় তার নান্দনিক সৌন্দর্য অভূতপূর্ব। এ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশের বহু ভ্রমণ বিলাসী মানুষের সমাগম ঘটে। হরেক রকম পশুপাখির আবাসস্থল তৈরি হয় যা পরিবেশের অসীম উপকার সাধন করে এবং নান্দনিকতায় নবতর সংযোজন ঘটায়।

গ) অর্থনৈতিক উপযোগিতা

১. উপকূলীয় বনাঞ্চলে বৃক্ষরাজির অর্থনৈতিক উপযোগিতা অপরিসীম। এ বনাঞ্চলে ভ্রমনকারী দেশে-বিদেশের পর্যটকদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পথ সম্প্রসারিত হয়। যার ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।
২. ফলজ উদ্ভিদ যেমন- নারকেল, খেজুর, তাল, কলা, আম প্রভৃতি থেকে উৎপাদিত ফসল উপকূলীয় মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়।
৩. বনাঞ্চলে উৎপাদিত মধু ও মোম থেকে অর্থ উপার্জিত হয়। ফল, ফল ও পল-বগুচ্ছ থেকে খাদ্যশস্য, শাকসবজি, পাখির খাদ্য, পশুখাদ্য পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	উকূলীয় বনায়নের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য খাতায় লিপিবদ্ধ পূর্বক তা নিয়ে ক্লাসে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর এবং পাশাপাশি উপকূলীয় বনে প্রাপ্ত বৃক্ষ সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের উপকূলীয় ১৯টি জেলার মধ্যে সাধারণত উকূলীয় বনাঞ্চল রয়েছে। এটি দেশের দক্ষিনাঞ্চল, দক্ষিণপূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের কয়টি জেলায় উপকূলীয় বনাঞ্চল রয়েছে?

ক) ১৯টি খ) ২০টি গ) ২১টি ঘ) ২৮টি

২। কোন জেলায় উপকূলীয় বন নেই?

ক) পটুয়াখালী খ) বরগুনা গ) ভোলা ঘ) বাগেরহাট

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও

আব্দুল হাসেম তার বন্ধুদের নিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত উপকূলীয় বন ভ্রমণে গেলেন এবং তিনি লক্ষ্য করলেন সেখানে নিয়মিত জোয়ার ভাটা হয়।

৩। উপকূলীয় বনভূমির পরিমাণ কত হেক্টর?

ক) ১,৯৭,০০০ খ) ১,৯৬,০০০ গ) ১,৯৫,০০০ ঘ) ১,৯৮,০০০

৪। উপকূলীয় বন দেশের মোট আয়তনের কত অংশ-

ক) ১.৩৬% খ) ২.২৩% গ) ১.৪৭% ঘ) ৩.৩৬%

পাঠ-১২.৯ ব্যবহারিকঃ গোল কাঠ বা তক্তা পরিমাপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কীভাবে গোল কাঠ চিরাই করতে হয় তা বলতে পারবেন।
- কীভাবে গোল কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় তা বলতে পারবেন।
- তক্তার পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবেন

গাছ কর্তনের পর সর্বপ্রথমে ডালপালা ছেটে চাহিদা মোতাবেক কান্ডকে কেটে টুকরো টুকরো করতে হবে। এ ধরনের টুকরোকে সাধারণত লগ বা গোল কাঠ বলা হয়। এ দৈর্ঘ্য প্রায় ২.৫ হতে ৪ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। গোল কাঠকে অনেক সময় বাকল ছেঁটে চারকোনা করা হয়। কিন্তু এখানে কিভাবে কাঠ চিরাই করলে সর্বাপেক্ষা কম কাঠ অপচয় হয়, সে বিষয়ের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

গোল কাঠ পরিমাপের উপায় ঃ

একটি গাছে কতটুকু কাঠ আছে তা নির্ণয়ের সবচেয়ে সঠিক পন্থা হল কান্ডের সিলিন্ডারের সাথে তুলনা করে সিলিন্ডারের পরিমাণ নির্ণয় করে কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করা। প্রতিটি গাছের কান্ড গোড়ার দিকে মোটা এবং উপরের দিকে সরু। আবার সব গাছের কান্ড একই রকম সরু নয়। ফলে সরাসরি সিলিন্ডারের সূত্র প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে কাঠের পরিমাপ নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য এবং ব্যবহার্য নয়। যদি কান্ড সিলিন্ডার আকৃতির হতো তবে খুব সহজে একটি লগে বা টুকরো কান্ডে কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করা যেত। নিম্নে তা দেখানো হল ঃ

আমরা জানি
একটি সিলিন্ডারের আয়তন = $\lambda r^2 l$
এখানে, r = ব্যাসার্ধ
l = উচ্চতা
λ = ধ্রুব সংখ্যা (যার মান ৩.১৪১৬)

উদাহরণ স্বরূপ ঃ একটি সিলিন্ডার আকৃতির কাঠের লগের ব্যাস ২০ সে.মি. এবং এর উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য ৩ মিটার হলে, কাঠের পরিমাণ কত ঘনমিটার।

কাজের ধারা ঃ

১। নির্বাচিত গাছের কান্ডের কাঠের পমিাণ করার জন্য কান্ডের দৈর্ঘ্যা প্রথমে ফিতা সাহায্যে মাপা হল।
২। এবার কান্ডের দুই প্রান্তের ব্যাস মেপে তাদের গড় বের করা হয়।
৩। সর্বশেষে উপরের সূত্র দ্বারা কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

এখানে, কান্ডের দৈর্ঘ্য l = ৩ মিটার
কান্ডের ব্যাস d = ২০ সে.মি.

সুতরাং কান্ডের ব্যাসার্ধ, $r = \frac{d}{2} = \frac{20cm}{2} = 10cm$

= ০.১০ মিটার

অতএব, কাঠের পরিমাণ = $\pi r^2 l$

= (৩.১৪১৫ × (.১০)^২× ৩) ঘনমিটার

= ০.০৯৪২ ঘনমিটার

দাঁড়ানো গাছে কাঠের পরিমাণ নির্ণয়

দাঁড়ানো গাছের কাঠের পরিমাণ সূত্র ব্যবহার করে সাধারণত নির্ণয় করা যায় ।

সূত্র ঃ কাঠের পরিমাণ (ঘনমিটার) = $০.০৮ \times \frac{বেড় ১ + (বেড় ২ \times ৪) + বেড় ৩}{৬} \times দৈর্ঘ্য$

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ ক) নির্বাচিত গাছ

খ) পরিমাপক ফিতা

গ) কাগজ, কলম ইত্যাদি

কাজের ধারা

১. নির্বাচিত গাছের কান্ডের কাঠের পরিমাণ করার জন্য ত্রিের মত করে কান্ডের দৈর্ঘ্য প্রথমে ফিতা দ্বারা মাপতে হবে ।

২. এবার কান্ডের মোটা, মাঝারি ও চিকল প্রান্তের বেড় ফিতা দ্বারা মেপে নিতে হবে ।

৩. সবশেষে উপরের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে ।

উদাহরণ ঃ ধরে নেই,

কান্ডের দৈর্ঘ্য = ২০ মিটার

চিকন প্রান্তের বেড় (বেড় ১) = ১ মিটার

মাঝের প্রান্তের বেড় (বেড় ২) = ১.৫ মিটার

মোটা প্রান্তের বেড় (বেড় ৩) = ২ মিটার

অতএব কাঠের পরিমাণ = $০.০৮ \times \frac{১ + (১.৫ \times ২) + (২ \times ৩)}{৬} \times ২০$

$= ০.০৮ \times \frac{১ + ৩ + ৬}{৬} \times ২০$

$= ০.০৮ \times \frac{১০}{৬} \times ২০$

$= \frac{১৬}{৬}$

= ২.৬৬৬ ঘন মিটার

তক্তার পরিমাণ নির্ণয়

তক্তার পরিমাণ নির্ণেয়ের ক্ষেত্রে তক্তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রথমে ফিতার সাহায্যে বের করে নিতে হবে । কাঠের পরিমাণ করার জন্য এ ক্ষেত্রে তিন মাত্রিক পরিমাণ নিম্নোক্ত চিত্রানুসারে ফিতার সাহায্যে মেপে নিতে হবে ।

ধরে নেই,
তক্তার দৈর্ঘ্য x = ৩ মিটার
তক্তার প্রস্থ y = ১ মিটার
তক্তার উচ্চতা h = ০.৫মিটার

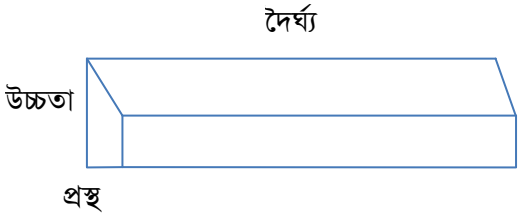

অতএব, তক্তার আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা
= ৩ × ১ ×০.৫ ঘন মিটার
= ১.৫ ঘন মিটার

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নোমান বাংলাদেশের বন সম্পর্কে তার শিক্ষক ড. রহিম সাহেব এর কাছে জানতে চাইলেন। তিনি প্রথম প্রকার বন সম্পর্কে বলেলন, 'এ বন বাংলাদেশের মোট বনভূমির বেশি এলাকাজুড়ে আছে এবং এখানে বেশ কয়েকটি শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে।' তারপর দ্বিতীয় প্রকার বন সম্পর্কে বলেলন, 'শীতকালে এ বনের পাতা ঝরে যায়। এ দুই প্রকার বন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।'

ক) বনভূমির কাকে বলে?
খ) বনভূমি কমে যাওয়ার কারণে কী?
গ) প্রথম প্রকার বনে কীভাবে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ) বর্ণিত দুটি বনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

২। কিশোরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা জনাবা রহিমা সামাজিক বনায়নের সাথে সম্পর্কিত। এ উদ্দেশ্যে তিনি সড়ক, মহাসড়ক, রেললাইনের পাশে বৃক্ষ রোপন করে থাকেন। তাছাড়া তিনি তার এলাকাবাসীদের বনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে থাকেন।
ক) গ্রোয়িং স্টক কাকে বলা হয় ?
খ) সামাজিক বনায়ন ও ম্যানগ্রোগ্রোভ বনায়নের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
গ) উপকূলীয় বনের অধিকাংশ প্রজাতির শ্বাসমূল থাকে কেন?
ঘ) "রহিমা বেগমের মতো তার এলাকাবাসী এ কর্মসূচিতে এগিয়ে আসলে বনায়নের অভাব পূরণ হবে"-উক্তিটি বিশ্লেষণ করে বনায়নের গুরুত্ব লিখ।

৩. রেহেনা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মতে তার বাড়ির দক্ষিণ দিকে পুকুর পাড়ে উঁচু ৮ শতক জমিতে মেহগনি বীজ রোপন করেন। এ জন্য তিনি ১৫ সে.মি. × ১০ সে.মি. আকারের পলি ব্যাগ ব্যবহার করেন। এতে করে রেহেনা ব্যাপক সফলতা লাভ করেন।
ক) বীজ নিষ্কাশনের প্রধান কয়টি পদ্ধতি?
খ) নার্সারি স্থাপনের একটি প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
গ) রেহেনার নার্সারির চারার সংখ্যা নির্ণয় করুন।
ঘ) রেহেনার সফলতার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

৪। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ শীর্ষক সেমিনারে বন কর্মকর্তা জনাব সাহেল আলী বলেন, বনভূমি ধ্বংসের কারণে অনেক বন্যপ্রাণী বিলুপ্তি মুখে যেমন- ঘড়িয়াল, সবুজ কচ্ছপ, পদ্ম-গোখরা ইত্যাদি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বনের অবদান অপরিসীম। তাই আমাদেরকে এসব বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক) বন সংক্ষনবিধি ও বন সংরক্ষণ অধ্যাদেশের মধ্যে পার্থক্য কি?
খ) বন আইন লঙ্গনের শাস্তির বিধান লিখুন।
গ) জনাব সাহেল আলীর বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।
ঘ) উদ্দীপকের বন ও বন্যপ্রাণীর প্রয়োজনীয়তা উদাহরনসহ পর্যালোচনা করুন।

৫. রোজিনা ও তার স্বামী বাড়ি তৈরির সময় গৃহে ব্যবহারের জন্য ২০ বছর পূর্বে লাগানো দুটি মেহগনি গাছ কেটে ফেলেন। গাছ দুটি কাটার সময় শ্রমিকরা কুঠার ব্যবহার করেন। তার গাছ ২টির লগের দৈর্ঘ্য ছিল ৮ মিটার, চিকন মাথার বেড় ২ মিটার, মাঝের অংশের বেড় ২.৫ মিটার ও মোটা মাথার বেড় ছিলো ৩ মিটার।
ক) কাঠ সিজনিং কী?
খ) আবর্তন কালের ভিত্তিতে গামার, শিশু কোন ধরনের উদ্ভিদ ব্যাখ্যা করুন?
গ) তাদের একটি গাছের ভলিউম নির্ণয় করুন।
ঘ) রোজিনা বেগমের গৃহীত কার্যক্রমটি সঠিক ছিল কি না বিশ্লেষণ করুন।

৬। নোমান ও সাহেল সাহেব নার্সারিতে বনজ, ফলজ ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করে জন সাধারণের নিকট বিক্রয় করেন। তাদের উৎপাদিত চারার মধ্যে রয়েছে মেহগনি, সেগুন, রেইনট্রি, ঔষধি উদ্ভিদের চারা, ফলের চারা ইত্যাদি। এ ব্যবসার মাধ্যমে অবসর সময়ে অল্প জায়গায় বেশি চারা উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে ভালো টাকা আয় করা সম্ভব।

ক) ব্যবহারিক নার্সারি বলতে কি বুঝ?
খ) পলিব্যাগ ও বেড নার্সারির মধ্যে দুইটি পার্থক্য লিখ।
গ) নোমান ও সাহেল সাহেবের উৎপাদিত চারা গাছ কোন দুই শ্রেণির নার্সারির উদাহরণ? তদের নার্সারির বর্ণনা দিন।
ঘ) "বনায়ন সৃষ্টি নার্সারির গুরুত্ব অপরিসীম"-নোমান ও সোহেলের উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর।

৭। বীজ হলো উদ্ভিদের প্রধান বংশ বিস্তারক উপকরণ। ভালো চারা পেতে হলে ভালো বীজ প্রয়োজন। গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর পরবর্তী বপন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা হয়। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ না করলে বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বীজের মানের অনবতি হয়।
ক) বীজ নিষ্কাশন বলতে কি বুঝ?
খ) আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নার্সারির অবদান কতটুকু
গ) বীজ সংরক্ষণের নিয়মগুলো ব্যাখ্যা কর।
ঘ) "বীজ সংগ্রহ ও বীজসংক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী"-উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৮। রেদওয়ানের বাবা নতুন বাড়ি নিমার্ণ করেন। দরজা-জানালার জন্য নিজের গাছ কেটে কাঠ বের করেন। রেদওয়ান কাঠ শুকানোর জন্য তার বাবাকে শুষ্ক মৌসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে। কিন্তু তার বাবা তড়িঘড়ি করে ঐ কাঠ দিয়ে দরজা জানালা তৈরি করেন।
ক) সিসিএ কি?
খ) কাঠ কেন সিজনিং করা হয় ব্যাখ্যা করুন।
গ) রেদওয়ানের বাবা কীভাবে গাছ কেটে ছিলেন তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
ঘ) "গাছের আবর্তনকাল ও কাঠ সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"-উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

৮। তাহেরপুর গ্রামের শিক্ষিত লোক সোহান বসতভিটা ও পুকুর পাড়ে ২৫-৩০ বছর ধরে বেড়ে ওঠা গাছ গুলোকে এখন তার প্রধান অবলম্বন বলে বিবেচিত করছেন। গাছ কাটার বিজ্ঞানসম্মত উপায় সম্পর্কে তিনি বন কর্মকর্তার নিকট পরামর্শ নিয়েছেন। এরপর সোহান সঠিক পদ্ধতিতে গাছ কাঠলেন এবং কাঠ সংরক্ষণ করলেন।

ক) কিলন ডাইং কি?
খ) আবর্তনকাল বা কর্তনকাল সময় বলতে কি বুঝ?
গ) সোহান সাহেব বন কর্মকর্তার কাছে বিজ্ঞানসম্মত যে উপায় সম্পর্কে ধারণা পেলেন তার সচিত্র বর্ণনা দাও
ঘ) বন কর্মকর্তার সাথে আলাপের পর সোহান সাহেব যা করলেন তার গুরত্ব বিশ্লেষণ কর।

৯। উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি ও তা সংরক্ষণ করা গেলে বহুবিধ উপকার সাধিত হবে। উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষা, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় প্রকোপ থেকে উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষার ক্ষেত্রে এ বনভূমির প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক। উপকূলীয় বনায়নের ফলে যে নির্মল সবুজ বেষ্টনী তৈরি হয় তার নান্দনিক সৌন্দর্য অভূতপূর্ব।

ক) ম্যানগ্রোভ বন কাকে বলে?
খ) উপকূলীয় বনের অবস্থান উল্লেখ কর।
গ) উপকূলীয় বন কিভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ রক্ষায় সাহায্য করে; ব্যাখ্যা কর।
ঘ) উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা বিশ্লেষণ কর।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ১২.১ : ১। ক ২। গ ৩। ক
উত্তরমালা- ১২.২ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। গ
উত্তরমালা- ১২.৩ : ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। ঘ ৫। গ
উত্তরমালা- ১২.৪ : ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ ৫। খ
উত্তরমালা- ১২.৫ : ১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪। গ ৫। ঘ
উত্তরমালা- ১২.৬ : ১। ক ২। ক ৩। খ ৪। খ ৫। খ
উত্তরমালা- ১২.৭ : ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ক
উত্তরমালা- ১২.৮ : ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ক ৫। ঘ